কালোপাঞ্জা

(২য় পর্ব)

—রোমাঞ্চকর রহস্য উপন্যাস—

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিবেশক
বেংগল পাবলিশার্স
১৪, বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

'শুনুন মিসেস্ চৌধুরী—আমি জানি আপনার ছেলে তার পিতার হত্যাকারী নয়—কিন্তু ঘটনা বিপর্যয়ে আজ লোকের যে সন্দেহ তার উপরে পড়েছে সেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়!—'

'য়্যাঁ—?' বিস্মিতা মিসেস্ চৌধুরী অশ্রুসিক্ত চোখে কিরীটির দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ! নির্মলবাবুকে সন্দেহ করবার অনেক কারণ আছে!'

'অনেক কারণ আছে?—'

'হ্যাঁ! আপনি সুস্থির হয়ে বসুন—আপনাকে সব কথা আমি খুলে বলছি! কিন্তু তারও আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, আপনাকে যা যা আমি জিজ্ঞাসা করবো কোন কিছু গোপন না করে ঠিক ঠিক তার জবাব দেবেন। কেমন? আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী আছেন?'

মিসেস্ চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন: তাই হবে কিরীটিবাবু।

'বেশ! কিন্তু এখানেত' আমাদের কথা হ'তে পারে না। চলুন উপরের ঘরে যাওয়া যাক। আপনাকে জিজ্ঞাস্য আমার অনেক কিছু আছে।'

'বেশ! চলুন!—'

দু'জনে উঠে দাঁড়ায়।

সিঁড়ির মুখে এসে কিরীটি বলে . বাথরুমে গিয়ে বেশ

করে আগে চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ হ'য়ে আসুন। আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য !

মিসেস্ চৌধুরী ধীর শ্লথ পদে নিজ কক্ষের দিকে চলে গেলেন।

কিরীটি তার নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে এসে সোফার 'পরে বসল।

নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

খোলা জানালা পথে শীত শেষের প্রসন্ন নীল আকাশের খানিকটা চোখে পড়ে।

বাইরে কোথায় একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

বাতাসে ফুলের মিষ্টি সৌরভ।

এক পক্ষে সত্যি ভালই হলো : হংসরাজ চাকলাদার নির্মলকে গ্রেপ্তার করে নিজের অজ্ঞাতেই যেন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটার গতি অন্য পথে চালিয়ে দিলে।

নির্মলের চারপাশে সন্দেহের জাল যেমন ভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল—এভাবে আচম্‌কা হংসরাজ তাকে গ্রেপ্তার না করলে আততায়ীর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা যে কোন পর্যন্ত বিস্তৃত হতো কে জানে ?

সে রাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে অন্ধকারে শিমুল তলায় বসে আকস্মিক ভাবে মৃণালিনীর অতীত রহস্য উদ্‌ঘাটন : তার সেই কথা : একটা উন্মাদ প্রতিহিংসার তাড়নায় সুকল্পিত চিন্তা ও বুদ্ধির দীপ্তি যে কি ভাবে বিকৃত হয়ে যেতে পারে—

তার চাইতে সহস্রগুণে এই ভাল হলো।

সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত লৌহ কারাগারে থাকুক ও এমনি করেই। কিছুদিন নির্ভয়ে নিঃসন্দেহে অবাধে বিচরণ করুক খুনী।

এদিকে কিরীটি তার অনিবার্য সূত্রগুলো একত্র করে বন্ধন রজ্জু আরো শক্ত ও কঠিন করে তুলবার অবকাশ পাবে।

আরো একটা বিষয়ে কিরীটি নিশ্চিন্ত: নির্মল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে যদি হংসরাজের অকারণ কৌতূহল বৃত্তি কিছুটা প্রশমিত হয়। অযথা ঘটনার ধারাটাকে যদি এলোমেলো না করে দেয়, কিরীটির কাজ করাও সুবিধা হবে।

ঘরের বাইরে মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

কিরীটি সোজা হয়ে বসে: মিসেস্ চৌধুরী আসছেন।

খুব সন্তর্পণে সহানুভূতির সংগে ওঁকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে: সামান্যতম কারণেও যেন বিচলিত না হন।

মিসেস্ চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

'আসুন মিসেস্ চৌধুরী! বসুন ঐ সোফাটায়।' কিরীটি কোমল ভাবে বলে।

নিঃশব্দে এসে মিসেস্ চৌধুরী কিরীটির নির্দিষ্ট সোফাটার 'পরে কিরীটির সংগে মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

সমগ্র মুখখানির 'পরে যেন একটা বেদনার বিষন্ন ছায়া নেমে এসেছে।

উপর্যুপরি কয়েকটা আঘাতে সত্যিই যে ভদ্রমহিলা ভেংগে পড়েছেন বুঝতে কষ্ট হয় না কিরীটির।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়ে যায়।

কিরীটির ইচ্ছা মিসেস্ চৌধুরীই নিজে থেকে কথা সুরু করেন। কারণ সে জানে—বিচলিত মাতৃহৃদয় একমাত্র পুত্রের আশু মংগল সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

কিরীটির অনুমান মিথ্যা হলো না : কিছুক্ষণ পূর্বে নীচের কক্ষে বসে যে কথাটি সে ওর পুত্র সম্পর্কে ইংগিতে জানিয়েছিল মাত্র, তারই জের টেনে মিসেস্ চৌধুরী মুখ খুললেন : মিঃ রায় ?

'বলুন—?'

'আপনি যে একটু আগে—' বলতে বলতে কথাটা যেন গলায় আটকে যায় মিসেস্ চৌধুরীর। সংকোচ ও দ্বিধায় উনি থেমে যান—মুখের কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই।

'থামলেন কেন ? বলুন না—কি বলতে চাইছিলেন ?' কিরীটি সস্নেহে আহ্বান জানায়।

'না—বলছিলাম একটু আগে নীচের ঘরে বসে আপনি যে বলছিলেন—ঘটনা বিপর্যয়ে নিমুর 'পরে যে সন্দেহ আজ লোকের পড়েছে সে একেবারে ভিত্তিহীন নয়—।'

'সত্যিই তাই মিসেস্ চৌধুরী! সব কথা বলবো ও শুনবো বলেই যখন আপনাকে আমি ডেকেছি—খোলাখুলি ভাবেই সব কথার আলোচনা করবো। সত্যি কথা বলতে কি—আপনার ছেলে নির্মলবাবুর নির্বুদ্ধিতার জন্যই ব্যাপারটা এত ঘোরালো হয়ে উঠেছে। তিনি যদি বৃথা সব কথা

গোপনের প্রচেষ্টা না করে অকপটে সব কিছুই খুলে বলতেন তবে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত এমন বিশ্রী মোড় নিত না।'

'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়।'

'যে রাত্রে আপনার স্বামী নিহত হন, প্রকৃতপক্ষে সেই রাত্রে নির্মলবাবু মধুপুরেই ছিলেন—অথচ—'

কিরীটির কথা শেষ হলো না। একটা অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন মিসেস্ চৌধুরী : সেকি ?—

'হাঁ! সে কথা উনি গোপন করে রেখেছেন বলেই আপনারা কেউ জানেন না—কিন্তু আমার চোখে নির্মল বাবু ধূলো দিতে পারেন নি। সামান্য একটা ব্যাপারেই সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।'

'বলেন কি ? নিমু সে রাত্রে মধুপুরেই ছিল ?—'

'হাঁ!—তিনি মধুপুরে পৌছেছিলেন শেষ রাত্রে—অর্থাৎ যে মেল ট্রেনটা পাস্ করে ভোর রাত্রি প্রায় পাঁচটা, নাগাদ সেই ট্রেনেই মধুপুরে এসে পৌচেছেন। আমি শুধু ঐ টুকুই জানি কিন্তু জানিনা পরের দিন সমস্ত সকাল দুপুর ও রাত্রি চারটা পর্যন্ত মোটামুটি ঐ ২৪ ঘণ্টা সময় তিনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন!'

'নিমু—নির্মল—!'

'এবং এও নিশ্চিত জানবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্মলবাবু ঐ চব্বিশ ঘণ্টার তাঁর সমস্ত গতিবিধির সংবাদ অকপটে স্বীকার করছেন আমাদের কাছে, তাকে বাঁচাবার আমাদের কোন উপায়ই

নেই ! আপনার স্বামী খুন হয়েছেন মধ্য রাত্রিতে আ[illegible] [illegible]লছেন মধুপুরে পৌঁচেছেন রাত্রি পাঁচটায়। অতএব তার পক্ষে, . চৌধুরীকে খুন করা [illegible]সম্ভব নয় [illegible] বিশ্বাস্যও নয় ! অন্য সব সম্ভাবনা ও কারণ গুলো ছেড়ে দিলেও ঐ একটি মাত্র কারণেই নির্মলবাবুর পক্ষে সন্তোষবাবুকে খুন করা physically impossible ! absurd ! কিন্তু তবু খুনীকে ধরতে হলে এবং যাবতীয় সব কিছু বুঝতে হলে নির্মলবাবুর ব্যাপারটা সর্বাগ্রে মীমাংসিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ! কারণ—'

'কারণ ?—'

'কারণ তিনি খুনী সত্যিকারের এক্ষেত্রে না হলেও—যিনি খুন হয়েছেন তাঁর সংগে নিকটতম সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সন্তোষবাবুকে খুন করবার মত কারণও ছিল।

খুন করবার মত কারণ ছিল ?—'

'হাঁ ! প্রথমতঃ ধরুন পিতা ও পুত্রের সংগে ইদানীং কিছুকাল ধরে সহজ সৌহার্দ্দের সম্পর্কটা যেন ঠিক পূর্বের মত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সন্তোষবাবুর অতীত জীবনের কয়েকটি পৃষ্ঠা—যার গুরুত্ব তাঁর এই অতর্কিতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশী বলেই আমি মনে করি !'

'আমার স্বামীর অতীত জীবনের কয়েকটি পৃষ্ঠা ?'

'হাঁ ! আপনার স্বামীর এই ভাবে নিহত হওয়ার ব্যাপারটা ঠিক অতর্কিত নয় মিসেস্ চৌধুরী ! হত্যাকারীর এটা একটা দীর্ঘ দিনের সুপরিকল্পিত plan এবং ঐ প্ল্যানের পশ্চাতে রয়েছে

গোপনে[illegible] আপনার স্বামী মিঃ চৌধুরীর অতীত জীবনের [illegible]ারাবৃত রহস্যময় কয়েকটি পৃষ্ঠা, যেটা হয়ত আপনার ছেলে আভাষে বা ইংগিতে বা অন্য কোন ভাবে জানতে পেরেছিলেন। এবং আমার যতদূর মনে হয় সেই কারণেই হয়ত কিছুকাল ধরে পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা মন কষাকষি চলছিল। তারপর আরো একটা কথা আপনি জানেন কিনা জানিনা, ইদানীং যে কারণেই হউক নির্মলবাবু তাঁর পিতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।'

'ঘৃণার চক্ষে দেখতো নির্মল আমার স্বামীকে? কি বলছেন আপনি কিরীটিবাবু?'

'আমার অনুমান এতটুকুও মিথ্যা নয় মিসেস্ চৌধুরী এবং সেই জন্যই বোধ হয় আপনার ছেলে আপনার স্বামীর মৃত্যুতে আঘাত এতটুকুও পাননি বরং অনেকটা নিশ্চিন্তই বোধ করেছেন।'

'কিরীটিবাবু!'—আর্ত অস্ফুট কণ্ঠে মিসেস্ চৌধুরী চীৎকার করে ওঠেন।'

'অনিবার্য সত্যকে এড়াতে চাইলেই কিছু এড়ান যায় না মিসেস্ চৌধুরী। সত্য চি[illegible] রূঢ় ও কঠিন। মানুষের জীবনে যখন কোন সত্য অতর্কিতে এমনি করে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, বিশেষ করে যে সত্যকে আমরা চাইনা, সে এমনিই মর্মান্তিক ও বেদনা ক্লিষ্ট হয়। অভিনয়! অভিনয়! যত বড় অভিনয়ই নির্মলবাবু করুন না কেন কিরীটির চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। শুনুন মিসেস্ চৌধুরী! আপনাকে আমি স্পষ্টাস্পষ্টিই

বলছি, যে-তিনটি কথা তিনি আমার কাছে মিথ্যা বলেছেন তার সবটুকু সত্য যতক্ষণ না তিনি আমায় খুলে বলছেন, তাঁকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান একেবারেই অসম্ভব।'

'তিনটি মিথ্যা কথা সে বলেছে?'

'হাঁ! ১নং, কোন টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি আসেন নি এখানে, এখানে আসা তাঁর ঐ দিনই রাত্রে আগে থাকতেই বোধ হয় ঠিক ছিল। এবং তাই যদি হয়ে থাকে তবে টেলিগ্রামগুলো তিনি কোথা হতে পেলেন? ২নং, এখানে এসেও কেন তিনি মিথ্যা কথা বললেন, কি কারণে তিনি এসেছিলেন? এবং 'ওভার কোট'টা সম্পর্কেই বা মিথ্যা কথা বললেন কেন? ৩নং, আমি যে চিঠি পেয়ে এখানে এসেছি সে চিঠির হস্তাক্ষর কার তা তিনি বেশ ভাল করেই জানেন তবু তিনি সে কথা মিথ্যা বললেন কেন? এবং শুধু নির্মলবাবুই নয় আপনি, হাঁ আপনিও আপনার ছেলের মত তিনটি মিথ্যা কথা বলেছেন—বজ্রের মতই কঠোর কিরীটির কণ্ঠস্বর!'

ঃ আমি মিথ্যা কথা বলেছি?

'হাঁ, বলেছেন! মিসেস্ চৌধুরী, আমি কিরীটি! একথার ঠিক তাৎপর্য আপনি হয়ত জানেন না, তাই সত্য গোপন করতে আপনি আমার কাছেও দ্বিধা বোধ করেন নি।'

'কিন্তু—'

'আপনি কি কি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছেন শুনবেন? ১নং

সে রাত্রে আপনার স্বামীর হত্যার যে বর্ণনা দিয়াছেন আমি তা বিশ্বাস করি না।'

ঃ বিশ্বাস করেন না ?

ঃ না !—'

ঃ কেন ?—'

ঃ কেন ? সে কথা এখনোও আমার বলবার সময় আসেনি তবে এটা জেনে রাখুন আমি সমস্তটুকু তার বিশ্বাস করিনি এবং না করবার মত আমার যথেষ্টই কারণ আছে। ২নং আপনি—হ্যাঁ ! আপনি ঐ চিঠির হস্তাক্ষর চেনেন ! কেমন বলুন ? জানেন না কে ঐ চিঠি আমাকে লিখেছে ?—'

ঃ আমি—-আমি সত্যি বলছি মিঃ রায়—'

'থাক ! গোপন রাখতে চান রাখুন ! পীড়াপিড়ী করবো না। ৩নং, আপনি আপনার স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে আমার কাছে যে অজ্ঞতার কথা বলেছেন, তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা !'

'মিথ্যা ?'

'হাঁ ! মিথ্যা ! অতবড় মিথ্যা ও অসত্য ইতিপূর্বে জীবনে আপনি কখনো উচ্চারণ্ করেন নি !'

কিরীটির কথায় মিসেস্ চৌধুরী যেন হতবাক ! বিমূঢ়।

ফ্যাল ফ্যাল করে বোবা আতংকগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মিসেস্ চৌধুরী।

কিরীটি আবার বলে ঃ মিথ্যা সংকোচের কোন প্রয়োজন নেই মিসেস চৌধুরী ! যা আপনি স্বেচ্ছায় গোপন করেছেন তা

আপাততঃ আমার কাছে না হয় গোপনই থাক! সময় হলে আপনিই তা আমার কাছে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে। কিন্তু আপনার ছেলেটি, তাকে ১নং ও ২নং মিথ্যা কথাগুলোত' স্বীকার করতেই হবে, নচেৎ তাকে বাঁচানো কারো সাধ্য নেই জানবেন।

'কিরীটিবাবু ?'

'বৃথা অনুনয়ে কোন ফল নেই মিসেস্ চৌধুরী! অন্যায় ও অসত্যকে আমি প্রশ্রয় দিই না।'

সত্যান্বেষী আমি—সত্যাশ্রয়ী, সত্যই আমার ধর্ম! অসত্য ও অন্যায়ের 'পরে কোন কিছুই দীর্ঘ কাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মিসেস্ চৌধুরী ।

—দুই—

—রক্ততিলকী—

মিসেস্ চৌধুরী কাঁদছেন আবার।

একি মহাসংকট, আজ তাঁর জীবনের পথে এসে দেখা দিল ?

একদিকে তাঁর নারীত্বের মর্যাদা—অন্যদিকে তাঁর মাতৃত্ব ! এক মাত্র পুত্র এজগতে তাঁর শেষ ও একমাত্র স্নেহের বন্ধন—তাঁর ছেলে—নির্মল ! একটিকে: বর্জন করতেই হবে, কিন্তু কাকে করবেন বর্জন ?—

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ যখন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করছেন—ব্যর্থতা, অপমান ও দুঃসহ লজ্জা।

অরিন্দম ! নিষ্ঠুর অরিন্দম—শেষে তাঁর জীবনটাকে এমনি করে ব্যর্থ করে দিল।

ক্ষমা করবে না সে অরিন্দমকে ! না, কিছুতেই সে ক্ষমা করবে না।

নির্মম আঘাত হানবে সে—তার মুখোসটা টেনে খুলে ফেলে তার সত্যিকারের রূপটা জগতের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত, করে দেবে।

একটা উন্মাদ প্রতিহিংসার আগুন যেন মিসেস্ চৌধুরীর

সমস্ত অন্তর জুড়ে জ্বলতে থাকে, দুঃসহ জ্বালায় অন্তর ক্ষত বিক্ষত হ'তে থাকে ।

কিন্তু !—কিন্তু কোথায় অরিন্দম ?

দুঃস্বপ্নের মতই অরিন্দম আজ তাঁর ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

তাঁর এত কল্পনার সাজান সংসার—আচম্‌কা ধূমকেতুর মতই যেন ও এসে সব তচ্‌ নচ্‌ করে দিয়ে গেল !

বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কত আশা ! কত আকাংখা ! কত কল্পনা !

কোথায় কোন মহাশূন্যে আজ সব মিলিয়ে গিয়েছে। ব্যর্থতা ! একটা বিরাট শূন্য রিক্ততা ! একটা মর্মন্তুদ হাহাকার !

কিন্তু না ! না ! এ সে হ'তে দেবে না।

অরিন্দমই শেষ পর্যন্ত হবে জয়ী !

বিজয় গৌরবে সে তার ধ্বংস স্তূপের ব্যর্থতার 'পরে দাঁড়িয়ে দেবে হাততালি !

ধীরে ধীরে কখন এক সময় চোখের অবিরল অশ্রুধারা শুকিয়ে গিয়েছে—দু'টি চক্ষু প্রান্ত শুষ্ক—অগ্নি গোলকের মত যেন জ্বলছে দু'টি অক্ষি গোলক ।

মমতাময়ীর করুণা নির্ঝর শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে বুকে ।

অমৃতের পাত্র বিষে আজ হয়ে উঠ্‌ল পূর্ণ !

সমস্ত অবসাদ—সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে সুমিত্রা উঠে দাঁড়াল।

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীর্ণ স্মৃতি সহসা যেন চৈত্রশেষের ঝরা পাতার মত কোথায় উড়ে গেল।

সুমিত্রা চৌধুরী নয়।

সুমিত্রা সান্ন্যাল।

একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছে—অতীতের কত স্মৃতি বিজড়িত কত হাসি, কত কান্না, ভালবাসা, মান অভিমানে ভরা পৃষ্ঠাগুলো।

শীত শেষের রিক্ত শিশির ভেজার মতই বেদনার অশ্রুসিক্ত স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো! তাকি ভোলা যায়? না সত্যিই কেউ ভুলতে পারে?

সুমিত্রা আর সুচিত্রা বহুদূর সম্পর্কীয় মামাত ও পিসতুত বোন।

প্রায় দু'জনেই সমবয়সী এবং সুচিত্রার মা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় সুচিত্রা তার মামা মামী, সুমিত্রার মা বাপের কাছেই মানুষ।

চার বছর বয়স থেকে তারা পাশাপাশি মানুষ হয়েছে।

কখনো তারা পরস্পর জানতে পারেনি যে তারা এক মার পেটের সন্তান নয়।

অচ্ছেদ্য ভালবাসা দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। একের অন্য অন্ত-প্রাণ!

*　*　*

ঐ দিন রাত্রে!

প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে একদল বেপরোয়া তরুণ মৃত্যুসংগ্রামে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

তাদের অদ্ভুত সব কার্যকলাপের টুকরো টুকরো রহস্যময় কাহিনী আমাদের শান্ত নিরুপদ্রব জীবনে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে যেতো মাঝে মাঝে!

শিউরে উঠতাম। রোমাঞ্চিত হতাম।

ভয় ও কৌতূহলে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা জাগত শিহরণ।

চিঠির জবাব দেবো—না দেবো না!

দেশের কাজ ত' অন্যায় নয়।

দেশকে ভালবাসার অধিকার ত' সকলেরই আছে।

অস্থির আবেগ-চঞ্চল সে দিন ও রাত্রিগুলো কি ভাবে যে আমার কেটেছে ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারি না।

কাউকে বলবারও উপায় নেই।

সামান্য পরামর্শ বা আলোচনা, তারও উপায় নেই! চিরদিনের সাথী সুচিত্রা, তাকেও একটি কথা বলিনি।

বুকের মধ্যে এমনি করে সংগোপনে কথা চেপে রাখার যে কি দুঃসহ যাতনা—বিশেষ করে মেয়েমানুষের পক্ষে, একমাত্র জানি আমি, আর হয়ত বুঝবে আমারই মত মেয়েমানুষ যারা।

কতবার ভেবেছি সুচিত্রাকে সব খুলে বলবো।

সুচিত্রা আমাকে সন্দেহ করছিল কিনা তখন তাও জানি না।

আরো আশ্চর্য লাগতো ওর মুখের দিকে চাইলেই। মনে হতো—সুচিত্রাও যেন দিবারাত্র কি ভাবছে।

তখনও জানিনা—ঠিক এমনি একখানি চিঠি সুচিত্রারও হাতে এসে পৌঁচেছে এবং সেও আমারই মত অন্তর্দ্বন্দ্বে দিন ও রাত্রি কাটাচ্ছে।

পাশাপাশি একই শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে বিনিদ্র রজনী দু'জনে কাটিয়েছি—অথচ কেউ কাউকে সামান্য প্রশ্নটুকু পর্যন্ত করবার সাহস পাই নি।

মরার মত দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে আছি! দু'জনেই জেগে—দু'জনেই দু'জনের কাছ থেকে নিজেকে লুকোবার, সেকি দুঃসহ প্রচেষ্টা!

শেষ পর্যন্ত চিঠির জবাব না দিয়ে আর থাকতে পারলাম না।

নির্দেশ মত একখানা খাম কলেজ কমনরুমের লেটার-বাক্সে রেখে এলাম।

এরপর একদিন দু'দিন করে পনেরটা দিন কেটে গেল।

অন্যপক্ষ হ'তে আর কোন সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই।

রোজ বাড়ীতে ফিরে এসে বইগুলোর পাতাগুলো একটার পর একটা উল্টে যাই।

না—কোন চিঠিপত্র কিছুই নেই।

তবে কি আমার চিঠি তারা পেল না?

কেমন একটা হতাশায় যেন মনটা ভারী হয়ে উঠলো।

ক্রমে যেন উত্তেজনাটাও থিতিয়ে এলো একটু একটু করে।

এমনি করে আরো পনেরোটা দিন চলে গেল দেখতে দেখতে।

মনে আছে আজও—সেটা বৃহস্পতিবার।

আমাদের এক বান্ধবীর বিবাহের নিমন্ত্রণে তার ওখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাড়ীর গাড়ীতে ফিরে এলাম।

গাড়ী থেকে নেমে ভিতরের দিকে যাচ্ছি, একটা লম্বা বারান্দা। আগেকার আমলের বাড়ী আমাদের।

বারান্দায় মোটা মোটা থাম ও সুউচ্চ খিলান।

বারান্দার সিলিং থেকে কেরোসিনের ঝোলান বাতি জ্বলছে।

সমস্ত বারান্দাটা অদ্ভুত একটা আলোছায়ায় যেন কেমন অস্পষ্ট ঘোর ঘোর।

আপন মনে সিঁড়ির দিকে চলেছি ঘুমও পেয়েছে, শরীরও ক্লান্ত।

হঠাৎ চাপা অথচ সুস্পষ্ট গলায় কে যেন পাশের থামের আড়াল থেকে ডাকল : সুমিত্রাদেবী!

থমকে দাঁড়ালাম।

স্পষ্ট শুনেছি ডাক!

কিন্তু—

'সুমিত্রা দেবী?' আবার ডাক শোনা গেল।

আশপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না।

রাত্রি প্রায় তখন একটা !

অতবড় বাড়ীটা একেবারে নিঃস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এতটুকু সাড়াশব্দ পর্যন্ত কোথাও নেই !

হঠাৎ গা'টার মধ্যে কেমন যেন ছম্ ছম্ করে উঠলো।

মৃদু ভীতকণ্ঠে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম : কে ?

সংগে সংগে অস্পষ্ট আলোছায়ায় আমার ঠিক দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল এক দীর্ঘ মূর্তি !

পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবী, মুখে একটা কালো মুখোস। কপালের মধ্যস্থলে ঠিক ১ সাংকেতিক ক্রমিক নম্বরটি কালো মুখোসের 'পরে শাদা অক্ষরে লেখা। স্তম্ভিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মুখ দিয়ে কোন শব্দও বের হলো না।

গলাটা যেন কেমন শুকিয়ে উঠছে।

'ভয় পেলেন সুমিত্রা দেবী ?—'

প্রশ্ন শুনে সামনের দিকে তাকালাম আবার।

নিজের অজ্ঞাতেই কণ্ঠ হতে উত্তর বের হয়ে এল : না।

'আপনার চিঠি আমরা পেয়েছি। সর্বাগ্রে তাই আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে : আপনার সংগে কিছু কথা ছিল। কোথায় আমাদের কথাবার্তা হতে পারে বলুনত ? আপনাদের বাগানে সম্ভব হবে কি ?'

'হবে।'

'বেশ! তবে তাই চলুন।'

*　　*　　*

একটা কামিনী গাছের পাশে গিয়ে দু'জনে দাঁড়ালাম।

কালো অন্ধকার রাত্রি যেন বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করে ফেলেছে।

কামিনী গাছটায় অজস্র শাদা ফুল ধরেছে, অন্ধকারে সেগুলো যেন স্বপ্নের চুম্‌কির মত মনে হয়।

বাতাস গন্ধে মন্থর!

মাঝে মাঝে দু'চারটা জোনাকী পোকা আলোর বাতি জ্বালাচ্ছে আর নিভাচ্ছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আগন্তুকই কথা বললে: দেশের ডাকে আপনি সাড়া দিয়েছেন এ যে কতবড় আনন্দের কথা তা কেমন করে আপনাকে বলবো!

কিন্তু কাজে নামবার আগে আমাদের সকল কথাই আপনাকে খুলে বলবো।

এ পথ বড় বিপদসংকুল। জীবন ও মৃত্যু নিয়ে এ পথের প্রতিটি মুহূর্ত ঘেরা। তাই প্রথম প্রশ্ন আমার, যদি বলি এই মুহূর্তে দেশের জন্য আপনাকে প্রাণ দিতে হবে?

স্থির অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলাম: দেবো!

সহসা আগন্তুক তার পকেট হ'তে একটা ধারালো ছুরির ফলা বের করে আমার সন্মুখে এগিয়ে ধরে বললে: ধরুন!

তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক! এই ছুরিটা দিয়ে আপনার একটা আংগুল কাটুন ত?

মনের মধ্যে যেন আগুনের ঝড় বইছিল। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে ছুরিটা হাতে নিয়ে বাঁহাতের বুড়ো আংগুলে বসিয়ে দিতেই আগন্তুক ক্ষিপ্র হস্তে আমার হাতটা চেপে ধরলো।

কি ছিল সে স্পর্শে জানিনা।

একটা তীব্র আগুনের স্রোত যেন আমার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে বহে গেল মুহূর্তে উগ্র কামনার মত!

'থাক! আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সুমিত্রা দেবী!

ঝর ঝর করে তাজা লাল রক্ত ক্ষতস্থান থেকে তখন ঝরে পড়ছে, এতটুকু যন্ত্রণা বোধও নেই!

সমস্ত দেহ ও সেই সংগে মন, যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

আগন্তুক নিজের ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সেই রক্ত নিয়ে আমার কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে: সুমিত্রা দেবী, আজ হতে দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনের রক্ত তিলক আপনার কপালে পড়লো। দেশের সেবায় আপনি উৎসর্গিতা হলেন। আজ হতে আপনি দেশের। দেশ সত্যিই আপনার!

তারপর একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে: আজকের মত আমি চললাম। প্রয়োজন হলে ডাক আসবে। প্রস্তুত থাকবেন।

চকিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—তিন—

—ঘরেতো ভ্রমরা এলো—

কিরীটি আবার ডাইরীটা পড়তে লাগলো।

সে রাত্রে শয়ন কক্ষে যে কি করে এলাম জানিনা।

ইতিমধ্যে নিজের দামী সাড়ীটার একাংশ ছিঁড়ে কাটা আংগুলটায় একটা পট্টি বেধে নিয়েছিলাম।

সুচিত্রার শরীর খারাপ বলে সে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যায়নি জানতাম।

এসে দেখি ঘরের আলো নিভান।

অন্ধকার।

শিয়রের কাছে একটা মোমবাতি দান থাকতো, প্রয়োজন হলে রাত্রে সেটা জ্বালান হতো।

আলো জ্বালতে আর ইচ্ছা করছিল না।

সমস্ত শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছে।

কিছু যেন ভাবতে বা চিন্তা করতে ও তখন পারছি না।

গভীর উত্তেজনার 'পর একটা অবসন্ন ক্লান্তি। অসহ্য ঘুমে দু'চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে।

কোন মতে বেশভূষা বদলিয়ে শয্যার 'পরে এসে এলিয়ে দিলাম শরীরটাকে।

উঃ কি ঘুম !

অনেকদিন অমন আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমাইনি।

* * *

ভাল করে রাতের অন্ধকার তখনো কাটেনি।

হঠাৎ ঘুমটা ভেংগে গেল।

চোখ চেয়ে দেখি পাশে সুমিত্রা স্থির নির্বাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'সুমি ?—'

ধড়ফড় করে শয্যার পরে উঠে বসলাম।

'তোর কপালে ওটা কি ?—,

আশ্চর্য হয়ে সুমিত্রার দিকে আমিও তখন তাকিয়ে। তারও কপালে যেন কিসের ফোঁটা !

রক্ত শুকিয়ে গেলে যেমন হয়—অনেকটা তেমনি ধরণের।

'তোর—তোর কপালে ওটা কি সুচি ?—' আমিও প্রশ্ন করলাম।

মুহূর্তে ও দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজলো : বাঁধ ভাংগা অশ্রুর বন্যা নেমেছে তখন ওর দুই চক্ষু বেয়ে। বক্ষ আমার অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে সুচি আমার বক্ষলগ্ন হয়ে কাঁদছে।

আমারও দু'টি চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে এল।

'আমাকে ক্ষমা কর্ সুমি! আমাকে ক্ষমা কর্! জীবনে কোন কথা আজ পর্যন্ত তোর কাছে লুকাইনি। এই একটা মাস ধরে কি যন্ত্রণা যে সহ্য করেছি—'

'তুইও আমাকে ক্ষমা কর্ সুচি! আমিও তোর কাছ থেকে সব গোপন করে কম যন্ত্রণা সহ্য করিনি।—,

দু'জনে দু'জনার কাছে অকপটে সব স্বীকার করলাম।

সুমিত্রার মুখেই শুনলাম ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় তারও রক্ত তিলকে দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

দু'জনেই আমরা যখন একই দলের, আর গোপনেরই বা প্রয়োজন কি?

বরং একদিক দিয়ে এ ভালই হলো!

এক বাড়ীতে একঘরে দিবারাত্র পাশাপাশি থেকে এ চেষ্টাকৃত গোপনতার সব কিছু আড়াল একদিন ভেংগে যেতই!

তার চাইতে এই ভাল হল।

দু'জনেই আমরা একই পথের পথিক।

সত্যি কথা বলতে কি—মনে মনে যেন নিজের দিক দিয়ে একটা সান্ত্বনাও পেলাম।

শুধু সান্ত্বনা নয়, মনের শক্তিও!

গুপ্ত বিপ্লব জীবনের দুঃসহ গোপনতার মধ্যে এর মূল্যও কম নয়।

ভাবতে পার কেউ আমাদের অবস্থাটা!

ধনীর দুলালী, জীবনের সহজ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এক পাশে

ঠেলে দিয়ে অনিশ্চিত বিপদসংকুল পথে অনির্দিষ্ট যাত্রা হলো

বাবা সরকারের পুলিশ বিভাগে ডেপুটি কমিশনার, রায়বাহাদুর, সরকারী মহলে অখণ্ড প্রতিপত্তি। দোর্দণ্ড প্রতাপ।

রায় বাহাদুর বাবার নামে যেন সকলে সশংকিত!

দেশের সর্বত্র তখন সুরু হয়েছে—গুপ্ত বিপ্লবী সংঘের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য জীবন পণ সংগ্রাম।

মাণিকতলার বোম্‌কেসে দেশের হাওয়া গরম।

ঘুমন্ত জাতির বুকে জেগেছে এক প্রলয়ংকর ঝড়ের তাণ্ডব।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সমস্ত কর্ম তৎপরতাকে অবহেলায় উপেক্ষা করে গুপ্ত বিপ্লবী সংঘ চারিদিকে ছড়িয়ে ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে—মহা সংগ্রামের জন্য।

সরকারী যথেচ্ছ দমননীতির রথচক্র নিষ্পেষ্ট করে, চলেছে নির্বিবাদে কত তরুণের জীবন স্বপ্ন।

লৌহ কারাবেষ্টনীতে ফাঁসীর দড়িতে কত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় পুলিশ কমিশনার পিতার অন্দরে আমরা হু'টি বিপ্লবী নারী দীক্ষা নিলাম মুক্তি যজ্ঞে।

স্বয়ং রায় বাহাতুর পুলিশ কমিশনারকে কে সন্দেহ করবে? তারই বাড়ীতে গোপনে তুটি তরুণী, বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছে কেই বা ভাববে?

এর চাইতে আর বড় নিরাপদ আশ্রয় আর কী হ'তে পারে?

যথা সময়ে আমরা তুই বোন ক্রমিক নং দেওয়া দলের মুখোস পেলাম। আমার নং হলো ৮ আর সুচিত্রার নম্বর হলো ৭।

জানিনা কেন দলপতি, অর্থাৎ যার ক্রমিক নং ছিল ১, প্রথম হতেই আমাদেরও দলের প্রধান দশজনের মধ্যে স্থান দিয়েছিল।

তু'এক মাসের মধ্যেই জানতে পারলাম দশজনের মধ্যে আমরা তু'জন অর্থাৎ আমি ও সুচিত্রাই ছিলাম নারী। অন্য সকলে পুরুষ।

এবং আমি ও সুচিত্রা যে পরস্পর পরস্পরকে চিনি সেকথা হয়ত একমাত্র দলপতি ১নং ছাড়া দলের আর কেউই জানত না।

দলের কোন মিটিং হলে কেউই আমরা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতাম না।

তাছাড়া সর্বদাই আমাদের যে মিটিং হতো, তাতে পুরুষের বেশে যেতে হতো বলে, কেউই হয়ত চট্ করে সন্দেহ করতে পারত না যে আমরা তু'জন ৮নং ও ৭নং পুরুষ নয় নারী। প্রথম প্রথম যে সংকোচ হতো না, তা নয়—বরং মিটিংয়ে গেলেই বিশেষ একটা সংকোচ অনুভব করতাম। ক্রমে ক্রমে সেটাও কেমন ধাতস্থ হ'য়ে গেল। কোন সংকোচ বা দ্বিধার বালাই আর অনুভব করতাম না।

হঠাৎ একদিন গুলী ছোড়ার ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদের তু'জনারই ডাক পড়লো।

প্রথম যেদিন আগ্নেয়াস্ত্রটি হাতে পেলাম—সে কি একটা অপূর্ব উন্মাদনা—কি পুলক শিহরণ!

তারপর হঠাৎ কোন কারণে প্রয়োজন হলে যাতে পিস্তল ব্যবহার করতে পারি সেই জন্য আমরা দু'জনেই একটি করে পিস্তল ও ২৫টি করে রাউণ্ড অর্থাৎ গুলি পেলাম।

পুরোপুরি এবারে বিপ্লবী বনে গেলাম।

তবে আমাদের যে বিশেষ কোন actionয়ে ডাক পড়তো তা নয়। সংবাদের আদান প্রদান, গুপ্ত সমিতির চিঠি পত্র লেখা, প্রচার কার্য চালান ও গোলাগুলি একস্থান হ'তে অন্যস্থানে চালান দেবার ছোটখাটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতেই, আমার ও সুচিত্রার ডাক পড়তো।

পড়াশুনা গোল্লায় গেল।

গুপ্ত সমিতির ব্যাপারেই সর্বদা ব্যস্ত আছি।

উগ্র নেশার মত যেন ঐ এক চিন্তাই সর্বদা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আমি যে নারী, বিশেষ রূপে যে আমার দেহ ও মন গঠিত, আমার দেহের আদিমতম সার্থকতা, প্রেম ও মাতৃত্ব পুরুষের সৃষ্টিকে ধারণ করে তাকে প্রাণ প্রাচুর্যে বিকশিত করে তোলাই যে আমার দেহের প্রতিটি কোষের সত্যিকারের পরিচয়, একথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

এই দেহের 'পর দিয়ে যে কুড়িটি বসন্ত তার ছাপ রেখে গিয়েছে তাও যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

খোলা বাতায়ন পথে প্রকৃতি কখন কি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তাও যেন দেখবার ফুরসুৎ ছিল না।

আচমকা বুঝি তাই একদিন পঞ্চশরের ভস্মরাশি খোলা বাতায়ন পথে এসে আমার ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

দখিনা পবন এলো চুপি চুপি! দেখলাম শৈল শিখরে ধ্যানমগ্ন শৈলপতির শ্রীচরণ তলে পর্বত দুহিতার আত্ম নিবেদন।

সুচিত্রার চোখের চাউনি চঞ্চল!—আনমনা ভাব।

জিজ্ঞাসা করলাম: কি হলো সুচি তোর?

সুচিত্রা কোন জবাব দিতে পারে না। মুখখানা সহসা রাঙা হয়ে ওঠে: চোখের পাতা কেমন বুজে আসে।

সত্যেন বান্যার্জী আমাদের এক ক্লাশ উপরে পড়ত।

প্রায়ই সত্যেন আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করতো।

সুচিত্রা আমার কানে কানে একদিন রাত্রে বললে: সত্যেন ব্যানার্জীকে তোর কেমন লাগে সুমি?

হেসে ফেললাম: কেন ভালইত!

বুঝতে আর কিছুই বাকী রইলো না।

আর একদিন রাত্রে!

হঠাৎ সুচিত্রা আমাকে বললে: জানিস সুমি সত্যেনও আমাদেরই দলের একজন?

: সে কি!—চমকে উঠলাম।

: হাঁ—তার নং ৯।

: তাহলে ?—

: ও বলেছে দল ছেড়ে দেবে—'

: কিন্তু এ যে বিশ্বাসঘাতকতা সুচি ? '

'কেন ? বিশ্বাসঘাতকতা কেন ? আমার মনোধর্ম কোন একটা বিশেষ পন্থাকে গ্রহণ করতে পারছে না; তাই সেই বিশেষ কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যাবো, এতে বিশ্বাসঘাতকতার কি আছে ? তা'ছাড়া সংসার করে কি দেশের সেবা করা যায় না ? আমরা'ত সন্ন্যাসী নই !'

'মানি ! কিন্তু বিপ্লবের পথ সংসারীর জন্য নয়। বিপ্লবীর দেশ-সেবা, আর সাধারণের দেশ-সেবার মধ্যে আকাশ জমিন পার্থক্য ! প্রতি মুহূর্তে যার প্রাণ বিপন্ন তার জন্যত' সংসারের বন্ধন নয় ! সংসারের মায়াডোরে কেন সে আবদ্ধ হবে ?

সুচিত্রা তবু নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করে।

কেমন যেন একটা বিরক্তি আসে সুচিত্রার প্রতি।

একি দুর্বলতা সুচিত্রার ?

সামান্য প্রেমকে সে জয় করতে পারবে না ?

হায়রে ! তখনত' জানিনা, ও সোমরস যে একবার পান করেছে সমস্ত জগত তার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

তখনত' জানিনা কত দুঃখে মদন ভস্মের পর কবি বলেছেন—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে—"

আমাকে গোপন করেই সুচিত্রা ও সত্যেন তখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে, গুপ্ত সমিতির সংগে সমস্ত সংস্রব তারা ত্যাগ করবে।

আমাদের বাড়ীতে বাবার এক বহুদূর সম্পর্কীয় পিসির ছেলে সুধাকান্ত থাকতো।

আমাদের বাড়ীতে থেকেই সে বি, এ, পাশ করে এম, এ পড়ছিল।

বাবার একমাত্র আমি ছাড়া অন্য কোন সন্তানাদি না থাকায় বাবা সুধাকান্তকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন।

ধীর লাজুক ও নম্র ছেলেটি।

লেখাপড়ায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল।

বাইরের বাড়ীতেই একটা ঘরে সে থাকতো। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎও হতো। সবচাইতে আশ্চর্য ছিল সুধাকান্তর দু'টি চক্ষুর দৃষ্টি!

অমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি জীবনে আর আমি দেখিনি।

কি একটা সম্মোহন শক্তি ছিল—সেই দৃষ্টিতে!

মাঝারী গোছের দীর্ঘ লম্বা দোহারা চেহারা, শ্যামবর্ণ গায়ের রং। মুখটা একটু লম্বাটে ধরণের, তীক্ষ্ণ উদ্ধত খড়্গের মত নাসা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মাথার চুলগুলো তৈলহীন রুক্ষ্ম।

পরিধানে সর্বদা থাকতো একটি মিলের ধুতি ও হাফসার্ট।

বেশী কথাবার্তা বলতো না।

বাড়ীতে বড় একটা থাকতো না—বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটাত।

সুধাকান্তের পরম বন্ধু ছিল দু'জন, সত্যেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ চৌধুরী!

প্রায়ই তারা সুধাকান্তের কাছে যাওয়া আসা করতো।

সন্তোষের মত অমন রূপবান পুরুষ আমি ইতিপূর্বে দেখিনি।

গায়ের রং সন্তোষের ঈষৎ তামাটে বর্ণের। খুব ফরসা রং—দীর্ঘদিন ধরে রৌদ্রে দগ্ধ হলে যেমন একটা পিংগল রুক্ষ আভা ফুটে বের হয়, অনেকটা তেমনি।

খুব লম্বাটে নয়, বেঁটেও নয়, মাঝামাঝি।

পেশল বলিষ্ঠ গঠন।

মাথায় ছোট ছোট ঘন কুঞ্চিত নিগ্রোদের মত পিংগল চুল।

পাঞ্জাবেই ওর জন্ম এবং জীবনের আঠারটা বছর ও পাঞ্জাবে মামার কাছেই মানুষ।

ছোটবেলায় সন্তোষের মা মারা গিয়েছিল।

অদ্ভুত বাঁশী বাজাত সন্তোষ!

মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে সুধাকান্তর ঘরে বসে ও বাঁশী বাজাত আপন খেয়ালে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐ বাঁশীই আমাদের পরস্পরকে পরিচিত করাল। আলাপ করে মুগ্ধ হলাম।

সন্তোষ সুধাকান্তরই সহপাঠি! এবং মিষ্টভাষী।

আমারও ঘরের খোলা দ্বার পথে একদিন ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।

—চার—

—ঝরী পোতী—

চমকে উঠলাম, সেই ভ্রমরের কম্পমান পাখার গুঞ্জনে !

সাত রঙের রামধনু কখন মনের আকাশের একপ্রান্তে উঠেছে তা'ত কই জানতেও পারিনি।

আকাশে বাতাসে একি হিল্লোল !

কার গুণগুণানি গানের সুর, এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে যায় ? হঠাৎ উঠি চমকে !

হঠাৎ লজ্জায় চোখের পাতা আসে বুজে।

সুচিত্রা একদিন বললে—আমাদের সুমির কি হলো গো ?

চকিত নয়ন, লাজ আভরণ
আহা কে অংগে দিল গো ?

ছুটে পালিয়ে গেলাম।

* * *

সত্যি কি আমি পাগল হয়ে গেলাম নাকি ?

* * *

দলে ঘুণ ধরেছিল।

টের পাইনি তা !

'রাউলাট' বিল পাশ হয়েছে।

পাঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগের রক্ত তখনও শুকায়নি !

ডিসেম্বর মাস !

হঠাৎ এমন সময় বিহারের এক প্রান্তে সমিতির এক বিশেষ গুপ্ত অধিবেশনের জরুরী পরোওয়ানা এলো, দলপতি ১নং য়ের কাছ থেকে !

পরোওয়ানা হু'জনের নামেই এসেছে : সুচিত্রা ও আমার।

কিন্তু কেমন করে যাবো সেই বিহারে ?

বাবাকে কি বলবো ?

* * *

হু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম বান্ধবীর ওখানে বেড়াতে যাচ্ছি বলে আমরা যাবো।

পরিকল্পনা মত বাবাকে বললাম।

বাবা তখন কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। বললেন—যাবে যাও কিন্তু সাবধানে থেকো—আর বেশী দেরী করো না।

জানতাম বাবা আমাদের কোন দিন কোন কাজে বাধা দেননি আজও দেবেন না।

হলোও তাই !

* * *

নির্দিষ্ট সময়ে বিহারে পৌছুলাম।

ছোট একটি গ্রামে, রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে এক কৃষকের ছোট্ট কুটিরে, নিভৃতে সংগোপনে গুপ্ত অধিবেশন বসল।

*　　*　　*

কোথা হতে কি হয়ে গেল।

আচম্‌কা যেন একটা ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য বয়ে গেল।

গুলি বারুদে, ধোঁয়ায়, সব হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড!

*　　*

সমিতি ভেংগে গিয়েছে।

মনটা কেমন বিষণ্ণ।

সুধাকান্ত হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

মাস দুই পরে হঠাৎ সন্তোষ এলো একদিন।

এবং খোলাখুলি ভাবেই আমার কাছে করলো বিবাহের প্রস্তাব।

বললাম ঃ বাবাকে বলো!

এতটুকু দ্বিধা না করে চলে গেল সে বাবার বসবার ঘরে বাবার সংগে দেখা করতে।

বাবার সংগে সন্তোষের কি কথা হয়ে ছিল জানি না।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন ও ফিরে এলো আমার ঘরে—মুখে হাসি!

*　　*　　*

একই রাত্রে একই লগ্নে-আমার সন্তোষের সংগে, আর সুচিত্রার সত্যেনের সংগে, বিবাহ হয়ে গেল।

* * *

দেড়টা বছর কেমন করে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, টেরও পেলাম না।

সে কি আনন্দ! কি সুখানুভূতি!

কোল জুড়ে এলো-নির্মল! আমার কামনার ফুল।

আমার সন্তান!

আমার স্বামী লোহার ব্যবসা সুরু করেছেন।

দিন দিন তাঁর ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে। চারিদিকে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ!

গৃহ যেন আনন্দে ও লক্ষ্মী-শ্রীতে ভরে উঠছে, দিনের পর দিন। জীবন দেবতার আশীর্বাদ যেন শতধারে ঝরে পড়ছে!

হায়! তখনত' জানিনি নদীর একপাড় যখন গড়ে ওঠে, অন্য পাড় ভেংগে চলে সেই সংগে সংগে।

* * * *

অকস্মাৎ শান্তির নীড়ে এলো—অশান্তির কালো হাওয়া।

* * * *

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি সন্তোষের পরিবর্তন! সর্বদা সে যেন আপন মনে কি ভাবে! চোখে মুখে চিন্তার একটা বিষন্ন ছায়া!

কেমন অন্যমনস্ক ভাব!

ভাল করে কথা বলে না, আগের মত কারণে অকারণে হেসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। না থাকতে পেরে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কি হয়েছে তোমার সন্তোষ?

'কই! কিছুত' হয়নি?---

বুঝলাম সে আমাকে গোপন করছে। আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কেমন অভিমান হলো! থাক্। ও যখন বলতে চায় না, আমারই বা কি এমন মাথা ব্যথা!

হঠাৎ এমন সময় অতর্কিতে এলো বজ্রাঘাত!

সন্তোষ কি একটা কাজে দিল্লী গিয়েছে। সন্তোষের লাইব্রেরী ঘরে বই খুঁজতে খুঁজতে, একটা সাংকেতিক চিঠি আমার হাতে পড়লো।

চিঠিখানা দেখেই যেন ভূত দেখবার মত চমকে উঠলাম।

এ সংকেত আমার চেনা!

এর সংগে যে আমি বিশেষ করে পরিচিত!

সংকেত থেকে চিঠির ভাষা উদ্ধার করতে, চমকে উঠলাম।

বুঝলাম সন্তোষও ছিল আমাদেরই গুপ্ত সমিতির একজন। এবং প্রধান দশজনের মধ্যে একজন।

তার সাংকেতিক ক্রমিক নং ছিল ৪!

চার! চার সাংকেতিক নম্বর!

আমার স্বামীর সাংকেতিক নম্বর ৪!

সমস্ত দেহটা আমার কেঁপে উঠলো।

একটা প্রচণ্ড অগ্নি গোলকের মত যেন চার ক্রমিক নম্বরটি, আমার দৃষ্টি জুড়ে বিভীষিকার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

মনে পড়ে গেল দেড় বছর আগে বেহারের প্রান্তে এক নির্জন শীতের রাত্রে, আমাদের গুপ্ত সমিতির জরুরী অধিবেশনের কথাটা।

৪নং সম্পর্কে দলপতির সেই বজ্র নির্ঘোষ: Traitor! বিশ্বাস ঘাতক!

আমার এতদিনকার এত যত্নের স্বপ্নসৌধ, যেন প্রচণ্ড একটা আঘাতে ভেংগে গুড়িয়ে গেল। পুষ্প স্তবকের মধ্য হতে সহসা যেন কাল সর্প ফনা বিস্তার করে গর্জে উঠলো।

ঘৃণায় লজ্জায় বার বার সমস্ত দেহ যেন আমার কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

কাকে আমি ভালবেসেছি!

কাকে নিয়ে আমার সুখের গৌরবের সংসার গড়ে তুলেছিলাম।

দুঃসহ অপমানে যেন আমার সমস্ত নারীত্ব কালো হয়ে গিয়েছে।

সন্তোষ! সন্তোষের আসল রূপ এই!

যাকে আমি দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছি, অন্তরের সমস্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা অকাতরে ঢেলে দিয়েছি যার পায়ের তলায়, এত নীচ! এত ঘৃণ্য সে!

সন্তোষের বাড়ী, ঘর, দুয়ার, আসবাবপত্র, সকল ঐশ্বর্য্য যেন আজ আমাকে ব্যংগ করছে!

প্রাসাদের আনন্দ, সুখ ও ঐশ্বর্য হ'তে মুহূর্তে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা, আমাকে একেবারে পথের ধূলায় এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সর্বাংগে অনুভব করছি, সহস্র বৃশ্চিক দংশন !

দিন সাতেক বাদে দিল্লী থেকে সন্তোষ ফিরে এল।

আমার সংগে দেখা হতেই ও প্রশ্ন করল : কি হয়েছে তোমার সুমি ? কোন অসুখ করেনি ত' ?

মৃদু হেসে জবাব দিই : না ত' !

'কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তোমার ? তোমাকে যে চেনাই যায় না ?'

ইচ্ছা হলো চীৎকার করে বলি : ভণ্ড ! কাপুরুষ ! বিশ্বাসঘাতক ! কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না।

সন্তোষ আমার কাছে আরো এগিয়ে এলো : বল ! নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে, সুমি ?

আমার হাত স্পর্শ করতেই, বিদ্যুৎ বেগে সরে এলাম। ও চমকে আমার মুখের দিকে তাকাল। ছুটে পালিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—সে কি দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব ! কি মর্মান্তিক ক্লেশ ! আমি কি পাগল হয়ে যাবো ?

একটু একটু করে স্বামীর সংগে সমস্ত সম্পর্ক আমার ছিন্ন করে দিচ্ছি।

যেখানে ভালবাসা নেই, নেই বিশ্বাস ও প্রীতির সম্পর্ক, সেখানে একত্রে পাশাপাশি ঘর করা যে কি দুঃসহ ক্লেশ—হায়! ভগবান! এ তুমি কি করলে?

রাত্রে চোখে ঘুম নেই; বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদি। চোখের জলে নিশি হয় অবসান।

মাঝে মাঝে সুচিত্রার সংগে দেখা হতো।

সুচিত্রা সত্যিই সুখী।

বড় আনন্দ লাগতো সুচিত্রার কথা ভেবে। অন্তত সুচিত্রা সুখী হয়েছে। তার সংসার সত্যিই সুখের সংসার।

দিনের পর দিন।

মাসের পর মাস—দীর্ঘ দু'টো বছর যে কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করেছি।

কোন বন্ধন নেই। কোন শাসন বা বাধ্যবাধকতা নেই, তবু—তবু মনে হয়েছে, কঠিন এক লৌহ-প্রাচীরের আবেষ্টনী যেন আমার চতুঃস্পার্শ্বে কাল সাপের মত বেষ্টন করে আছে।

আমি বন্দী!

কিন্তু এমনি করেই কি আমার জীবনের বাকী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে?

এখনো যে যৌবন তার প্রান্তসীমায় পৌঁছায় নি।

না! না—সত্যিই এর একটা বোঝাপড়া করা প্রয়োজন।

স্বামীর সংগে আমার খুব কমই সম্পর্ক !

দিনান্তে একবারও দেখা হয় কিনা সন্দেহ। অন্দরে আমার মহলের দিকে, তিনি কচিৎ কখনো আসেন।

নিজের ব্যবসা ও কাজ কর্ম নিয়েই তিনি ব্যস্ত।

আমার সংসার—আমার একমাত্র ছেলে নির্মলকে নিয়ে।

মাতা পুত্রে মিলে আমাদের ছোট্ট নীড়।

সে নীড়ে প্রবেশাধিকার কারো নেই।

এমনি করে দীর্ঘ ১৮টা বছর কেটে গেল।

দ্বিতীয় মহাসমর আসছে! তারই অবশ্যম্ভাবী ইংগিত পৃথিবীর সর্বত্র।

সন্তোষ তার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে এলাহাবাদ গিয়েছে।

সময়টা শীতের শেষ।

নির্মল ও আজকাল সন্তোষের ব্যবসার মধ্যে ঢুকেছে। কলকাতার অফিসের, এক প্রকার সেই ইনচার্জ !

ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই, নির্মলকে বাইরে বাইরে থাকতে হয়, আমার সংগে দেখা সাক্ষাৎ হয় খুবই কম।

রাত্রি বোধ করি বারটা বেজে গেছে।

ঘুম আসছে না !

অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছি।

রাত্রি !

কালো রাত্রির অন্ধকার ! আকাশে মেঘ করেছে !

চারিদিকে কেমন একটা বিষন্ন থম থমে ভাব ! অন্ধকার ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই, শুধু খোলা জানালা পথে বাগানের ভিতর হতে থেকে থেকে ভেসে আসছে—ঝিঁঝি পোকার একটানা মৃদু ঝিঁ-ঝিঁ শব্দ।

হঠাৎ ঘররে মধ্যে যেন অন্ধকারে, একটা অস্পষ্ট শব্দ মর্মরিত হয়ে উঠলো।

অন্ধকারে, চোখ মেলে তাকালাম : কিসের শব্দ ?

অতি সন্তর্পণে যেন কে এসে ঘরে প্রবেশ করল : কে ?

শয্যার 'পরে উঠে বসতে যাবো, হঠাৎ মৃদু চাপা কণ্ঠস্বর কানে এলো : সুমিত্রা ?

'কে ?'

'ভয় পেয়ো না সুমিত্রা ! আমি অরিন্দম।'

অরিন্দম !

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না'ত ?

'সুমিত্রা আমি অরিন্দম !'

'অরিন্দম ?—'

'হাঁ ! অরিন্দম।

'আপনি ! আপনি বেঁচে আছেন ? '

'দুর্ভাগ্য ! সত্যিই বেঁচে আছি আমি ! অধিবেশনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলাম—গেলে না যে অধিবেশনে ?'

'অধিবেশনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন? কই! আমি'ত কোন চিঠি পাইনি?'

'চিঠি পাওনি?'

'না।—'

'আমাকে হঠাৎ এতকাল পরে আসতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছো, না?—'

'আমি ভেবেছিলাম—'

'ভেবেছিলে মরে গিয়েছি, না? সত্যি এর চাইতে বোধ হয় মৃত্যুও ভাল ছিল। এ তোমাদের কি অধঃপতন? একদিন যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলে—কেমন করে তা ভুললে, সুমিত্রা?

এ কার? কার কণ্ঠস্বর! বহুকালের বিস্মৃতির যবনিকা পার হয়ে এ কণ্ঠস্বরে যেন চেনা ও জানা একটা সুরের আভাষ পাচ্ছি। না—না! তাকি সম্ভব! তবু বললাম:

প্রতিজ্ঞা?

'হাঁ—প্রতিজ্ঞা! কিন্তু তাতেও ক্ষতি ছিল না সুমিত্রা! শেষ পর্যন্ত এ তুমি কি করলে? একজন বিশ্বাসঘাতক হীন চরিত্রের লোকের গলায় মালা দিলে?'

সহসা কেন জানি না অরিন্দমের কথায় সর্বাংগ আমার জ্বলে উঠলো!

যে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় এই দীর্ঘ আঠার বছর ধরে নিজে জ্বলে পুড়ে মরেছি—সেই যন্ত্রণার 'পরে অরিন্দমের কথা গুলো

বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিল। নিজের দৈন্য—সে আমারই একান্ত ও নিজস্ব লজ্জা !

তীক্ষ্ণ স্বরে বললাম: তারই জবাবদিহি নিতে কি এতকাল পরে, আপনি একজন ভদ্রলোক হয়ে গভীর রাত্রে এক ভদ্র নারীর নিভৃত শয়ন কক্ষে এসে, চোরের মত প্রবেশ করেছেন ?

'সুমিত্রা ?'

'আজ আমি আর বিপ্লব সমিতির কেউ নই। চব্বিশ বছর আগেকার সুমিত্রা আজ আর বেঁচে নেই !

'বেঁচে নেই—না ?

'না !—'

'বেশ, তবে আমিও চল্লাম।'

অরিন্দম চলে গেল।

আবার সাতদিন পরে এক রাত্রে, অরিন্দমের আবির্ভাব হলো আমার শয়ন কক্ষে।

'আবার আপনি কেন এসেছেন ? সেদিনই ত' আপনাকে আমি শেষ কথা বলে দিয়েছি !'

'কিন্তু তোমার এ সুখের ঘরে যদি আজ আমি আগুন ধরিয়ে দিই সুমিত্রা দেবী ? ফুলে ফলে সাজান বাগান, না ? যদি আজ আগুন জ্বেলে সব ভস্ম করে দিই ?'

'যান ! আপনি এই মুহূর্তে এখান হ'তে চলে যান। নইলে মি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো !'

'তাতে কেলেংকারীটা আমার চাইতে তোমারই বেশী হবে! যে ঘরের বড়াই করছো, সে ঘরের দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে '

'নীচ্! শয়তান! আপনার ছায়া দেখলেও পাপ হয়!

'নীচ্! শয়তান! কিন্তু নীচ্-শয়তান করেছে আমাকে কে? কে করেছে পূজার নৈবেদ্যকে কলুষিত? লজ্জা করেনা তোমার! একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের গলায় মালা দিয়ে পতিব্রতার অভিনয় করে চলেছো?—'

'অভিনয়? '

'অভিনয়, নয়?—চিরাচরিত প্রেমের অভিনয়ই যদি করবে মনে ছিল—তবে কেন—কেন এসেছিলে দেশ সেবার ছল করে, গুপ্ত সমিতিতে নাম লিখাতে?'

'ছল করে নাম লিখিয়ে ছিলাম?—'

'ছল নয়? ছলনাময়ী নারী!—'

'বেরিয়ে যাও! এখুনি বেরিয়ে যাও এঘর থেকে—নইলে তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো!—'

•

দীর্ঘ উনিশ বছর যে স্মৃতিকে সযতনে বুকের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, হঠাৎ যেন আগুনের স্পর্শে সহসা সহস্র শিখায় তা লেলিহান হয়ে উঠলো।

গভীর রাত্রে পা টিপে টিপে ওর লাইব্রেরী ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সমস্ত বাড়ীটা ঘুমের ঘোরে যেন নিঃস্তব্ধ।

লাইব্রেরী! আমার স্বামীর লাইব্রেরী!

থরে থরে সব বই সাজান।

নির্দিষ্ট আলমারীটা খুলে, তার মধ্যস্থিত বইয়ের থাকের পিছনে হাত চালিয়ে অল্প খুঁজতেই, বের হয়ে এলো কালো কাপড়ে মোড়া, বহুকাল আগে সংগোপনে রাখা একটা বস্তু।

খুলে ফেললাম—একটি ছোট অটোমেটিক পিস্তল, একটি সাংকেতিক নম্বর লেখা মুখোস।

মুখোসটি দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল, ঠিক অমনি আর একটি মুখোসের কথা: তার নম্বর চার।

এরপর হ'তে আমার প্রতি-রাত্রের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এইগুলো দেখা।

প্রতি-রাত্রে চোরের মত সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, পা টিপে টিপে একা একা লাইব্রেরী ঘরে আসি, তারপর আলমারী থেকে মুখোস ও পিস্তল বের করে, নির্ণিমেষে চেয়ে থাকি দু'টি বস্তুর প্রতি!

এ আমার কি হলো?

হঠাৎ একদিন অরিন্দমের একখানা চিঠি পেলাম।

সুমিত্রা—

আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই—তোমাকে আমি প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিলাম—এবং সে ভালবাসা আজও আমার—

ছিঃ! ছিঃ!

শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পড়িনি।

তীব্র ঘৃণায় চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ফেলেছি।

অরিন্দম এত নীচ্! এত কাপুরুষ!

কোন মানুষ এত খানি নীচে নামতে পারে, এ যেন আমার ধারণারও অতীত ছিল।

এরই নাম দেশ প্রেম!

সদ্বংশজাত, ভদ্রসন্তান, শিক্ষিত--তার এতদূর অধোগতি হ'তে পারে?

এরই নাম কি দেশ প্রীতি!

একজন নারীকে দেশপ্রেমের মংগল মন্ত্রে আহ্বান করে, গোপন প্রেমের হীন লালসাকে পরিপোষণ করা!

এই কারণেই তাহলে তাকে দলে টেনে নেওয়া হয়েছিল।

এতদূর সে আজ নেমে গেছে যে, কোন একজন নারীকে পরের স্ত্রী ও সন্তানের মা জেনেও, তাকে প্রেম নিবেদন করতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করলে না?

সমস্ত পুরুষজাতির মুখে লেপে দিল, দুরপনেয় লজ্জার কলংক কালিমা?

ছিঃ। ছিঃ! ছিঃ!

তাড়াতাড়ি উঠে চিঠির দুমড়ানো টুকরো টুকরোগুলো তুলে, দেয়াশলাই জেলে পুড়িয়ে ফেললাম।

শুধু চিঠিই নয়—ঐ ভস্মস্তূপের সংগে অরিন্দমের স্মৃতিও ভস্মে পরিণত হোক!

বিপ্লব জীবনের সমস্ত স্মৃতির অবসান হোক।

ছিঃ ছিঃ এ কি লজ্জা! কি ঘৃণা!

উঃ! কি স্পর্দ্ধা!

আবার অরিন্দম আমার সামনে এলো!

ঘুমিয়ে ছিলাম নিজের শয়ন কক্ষে—চোরের মত চুপি চুপি এসে আমার নাম ধরে ডাকতেই, ধড়ফড় করে উঠে বসলাম শয্যায়।

আলো নিবানো। ঘর অন্ধকার!

বর্ষাকাল—বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

মেঘে মেঘে আকাশ একেবারে কালো অন্ধ হয়ে গিয়েছে। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক চকমকিয়ে ওঠে।

'কে?—'

'আমি অরিন্দম!—

সহসা বৈদ্যুতিক তরংগাঘাতে যেন, সর্বশরীর আমার কেঁপে উঠলো। সমস্ত বোধ শক্তি আমার অসাড় নিঃস্পন্দ হয়ে গেল।

রাগে সর্বশরীরে আমার যেন আগুন জ্বলে উঠলো। প্রথমটায় কোন কথাই আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হলো না: উত্তেজনা, লজ্জা, ভয়, অপমান ও ক্রোধ সব কিছু মিলে বুকের মধ্যে যেন আমার ঝড় বইছে।

'কোন সাহসে তুমি আবার আমার সামনে এসেছো?

তুমি ভদ্র সন্তান, না অন্য কিছু? ঘুমন্ত একজন পরস্ত্রীর কক্ষে এই নিভৃত রাতে, তোমার পা দিতে লজ্জাবোধ হলো না এতটুকু? ভদ্রতা বা শিক্ষায় বাধলো না?—

'সুমিত্রা?—'

'Shut up you mean scoundrel! আমার হাতের কাছে চাবুক থাকলে—

'আমাকে চাবুক পেটা করতে? শোন সুমিত্রা! অত আস্ফালন ভাল নয়। ভুলে যেও না আমিও অরিন্দম। আমি লম্পট, হীন চরিত্র সব কিছু হতে পারি; কিন্তু তবু, তবু আমি বিশ্বাসঘাতক নই।'

'বিশ্বাসঘাতক! পথের কুকুরও তোমার চাইতে ভাল।'

'তাই বটে। পথের কুকুরের চাইতেও হীন! কিন্তু আজ! আজ আমার এ অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? কারা? ভাবতে পারো—স্বামি সোহাগিনী লক্ষপতি সন্তোষ চৌধুরীর স্ত্রী—সমস্ত জীবনের তিল তিল করে বুকের সমস্তটুকু আশা আকাংখা ও শ্রম দিয়ে গড়ে তোলা স্বপ্নের সৌধে, কারো যখন আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন তার মনের অবস্থা কি হয়? জীবনের প্রচুর সম্ভাবনা, গৌরব, উচ্চাকাংখা, প্রতিষ্ঠা সব কিছু অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে, যে একদিন কয়জনকে বিশ্বাস করে জীবন-মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছিল, চক্রান্ত ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে তাকে যখন সর্বস্ব হারাতে হয়, তার মনের অবস্থা কি হতে পারে? ভাবতে পারো, যাকে সে একদিন

নিজের সর্বস্ব দিয়ে অন্তরের সমস্তটুকু প্রেম নিঙড়ে, হৃদয়ে গোপনে মানসীর আসনে বসিয়েছিল—চোখের উপর দিয়ে সেই মানস প্রতিমা যখন আর একজনের, বিশেষ করে যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নকে ধূলায় লুটিয়েদিয়েছে তার অংকশায়িনী হয়, বলতে পারো তখন সে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কি তার মনের অবস্থা হয়?

'সব—সব তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র! তোমার সংকীর্ণ মন ও রুচির বিকৃতি! যা নয়, তাকে তুমি হয় করে মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে বেড়িয়েছো। তোমার বিকৃত কল্পনার প্রাসাদ যদি আজ গুঁড়িয়ে যায়ই—তার জন্য দায়ী তুমিই!

'আমি?'

'হাঁ। নইলে এই কি প্রতিশোধের পথ? আক্রোশে তুমি আজ অন্ধ! তাই তোমার হিতাহিত জ্ঞান, সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যতাটুকু পর্যন্ত হারিয়েছো!—'

'শোন সুমিত্রা—মন আমার যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, তবু ভুলো না রক্তে মাংসে আমিও একজন মানুষ। তোমাকে একদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম।

ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার সর্বশরীর—সংকুচিত হয়ে ওঠে!

শোন! শোন—হাঁ ভাল আজও বাসি এবং আমার সে ভালবাসার মধ্যে কোন পাপ নেই জেন। সে ভালবাসার ধারণা মাত্রও তুমি করতে পারবে না। তা যদি তুমি পারতে, তাহলে আজ এভাবে বিষোদ্গার করতে অন্তত

এতটুকু কুণ্ঠাও তোমার হতো। তোমার সে ভালবাসার কথা শুনতে ঘৃণা, লজ্জা হতে পারে কিন্তু আমার—'

'তোমার লজ্জা হচ্ছে না, কারণ সত্যিই তুমি লজ্জাহীন!'

'হয়'ত তোমার কথাই ঠিক সুমিত্রা, নইলে যে কথা ভেবেছিলাম কোন দিন কেউ জানবে না, সে কথা কেমন করে উচ্চারণ করলাম। কিন্তু এও জেনে রাখ সুমিত্রা—মানুষের দেহে যে ভগবান বাস করেন, অরিন্দমের অন্তর হতে আজ সে নির্বাসিত। ক্ষমা করবো না। আমি কাউকেই ক্ষমা করবো না। আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তোমরা সুখের নীড় রচনা করে জীবনকে সার্থক করবে, এআ ামি হতে দেবো না। আজ আমি চললাম; শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

অকস্মাৎ যেমন সে এসেছিল অন্ধকারে, তেমনি অকস্মাৎ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। আকাশে বজ্র হুংকার শোনা গেল,—বিদ্যুতের অগ্নি ইশারা!

—পাঁচ—

—'সহজ মেয়ে নয়'—

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত !

মীনু সত্যিই যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

সংবাদটা অবিশ্যি এনেছে সুব্রত : কিরীটি সুব্রতকে 'তার' করে জানিয়েছে এবং 'তারের' মধ্যেই কিরীটির নির্দেশ ছিল জরুরী, সংবাদটা যেন কবি মৃণালিনীকে অতি অবিশ্যি এবং যত শীঘ্র সম্ভব জানান হয়। 'তারের' আসল উদ্দেশ্যটা উহ্য থাকলেও, কিরীটির অলিখিত সংকেতটির মর্মার্থ গ্রহণ করতে সুব্রতর কষ্ট হয়নি।

'তার' পাওয়ার সংগে সংগেই তাই সুব্রত এতটুকু দেরী না করে সোজা মৃণালিনীর বাড়ীতে এসে সংবাদটা যথাস্থানে পেশ করেছে।

সন্তোষ চৌধুরীর হত্যাপরাধে, তাঁর একমাত্র পুত্র নির্মল চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

মীনু বৈকালিক চা-পানান্তে নিজের ঘরে সোফার পরে গা এলিয়ে একখানা মাসিকের পাতা উল্টাচ্ছিল। ভৃত্য এসে সংবাদ দিল—সুব্রতবাবু এসেছেন।

কি ভেবে মীনু ভৃত্যকে বললে : তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

একটু পরেই সুব্রত ভৃত্যের পিছু পিছু ঘরে এসে প্রবেশ করল।

'আসুন সুব্রতবাবু! বসুন।—'

সুব্রত একখানা চেয়ার অধিকার করে বসল।

'চা আনতে বলি?—'

'আনুন!—'

'যা! চা নিয়ে আয়।—' ভৃত্যকে আদেশ দিতেই সে চলে গেল।

'রহস্যভেদীর কাছ থেকে বোধ হয় কোন সংবাদ এসেছে?—' মীনু প্রশ্ন করে সহাস্যে।

'সত্যিই তাই। কিন্তু আঁচ করলেন কি করে?—'

'আপনারা কি ভাবেন সুব্রতবাবু, মস্তিষ্কপদার্থটি একমাত্র আপনার ও আপনার বন্ধুরই একচেটিয়া সম্পত্তি?—'

সুব্রত হেসে ফেলে : না তা হবে কেন? কিন্তু সে কথা থাক। এখন বলুন আমার বক্তব্যটুকু সভয়ে না নির্ভয়ে পেশ করবো?—'

'সত্যি, খুব serious নাকি?—' কৌতুক ভরা মীনু সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।'

'বিচার সাপেক্ষ—' স্মিতভাবে জবাব দেয় সুব্রত।

'তাহলে নির্ভয়েই বলুন।—' হাসতে হাসতে মীনু বলে

'কিরীটি আপনাকে জানাতে 'তার' করেছে, নির্মলবাবু তাঁর পিতার হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন!' মুহূর্তে যেন মীনুর মুখের সমস্ত হাসিটুকু দপ্ করে নির্বাপিত হয়ে গেল।

'কি হলো! বড্ড যেন Shocked হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে—তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই খুব serious নাকি, মৃণালিনী দেবী?' এবারে সুব্রতর প্রশ্নের পালা।

কয়েক সেকেণ্ড গুম্ হ'য়ে থেকে সহসা মিনু প্রশ্ন করে: তা এসংবাদটা, হঠাৎ আপনার বন্ধু আমাকে দেবার জন্য আপনাকে 'তার' করলেন কেন?

'কেন—তা সে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?—' !'

'মোটেই নয়! তাই ত' জিজ্ঞাসা করছি!—'

'তা হ'লে এবারে কিন্তু আপনারই প্রশ্নটিকে পাল্টা পেশ করছি আপনাকেই—মস্তিষ্ক পদার্থটি নিশ্চয়ই আপনারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়! শুনুন মৃণালিনী দেবী! বড় সাংঘাতিক লোককে নিয়ে আপনি লুকোচুরী খেলছেন। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থেকে এবং একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েও, জোর গলায় বলতে পারি না—কিরীটির চিন্তাশক্তির হদিস সব সময় যথার্থভাবে পাই! তার ব্যবহারে কখনো মনে হয়েছে অতবড় নিরেট ও হাবাগবা মানুষ বুঝি দ্বিতীয়টি নেই-কখনো আবার মনে হয়েছে ওরকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও আত্ম-সচেতন মানুষ বুঝি এ দুনিয়ায় সত্যিই বিরল। কোন্‌টি যে ওর

সত্যিকারের রূপ, আজও সত্যিকথা বলতে কি—তেমন করে বুঝে উঠতে পারিনি বা পারি না।

'বন্ধুর সম্পর্কে ধারণাটা আপনার সত্যিকারের যাই হোক না কেন, শ্রদ্ধাটা যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, সুব্রতবাবু?—'

'না! ঠিক তার যতটুকু প্রাপ্য তার চাইতে একতিলও বেশী নয়।'

তারপর একটু থেমে হঠাৎ আবার সুব্রত বলে: একটা কথা বলবো মৃণালিনী দেবী, কিছু যদি না মনে করেন!

চলে 'নিশ্চয়ই বলবেন! শাস্ত্রে আছে দশ পা একত্রে গেলেই ।।ক বন্ধুত্ব হয়—তা আপনার সংগে যা পরিচয় তাতে দশ পা ছেড়ে দশ যোজনও বলতে পারেন। কাজেই আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে বন্ধুত্বের দাবী করতে পারি বই কি! এবং সে ক্ষেত্রে—'

'দেখুন! কথাটা তা'হলে খুলেই বলি! সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা ব্যাপারে আপনি কতটুকু মুখ্যভাবে অনুসন্ধিৎসু জানিনা এবং জানবার ইচ্ছাও নেই। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি আমাদের নির্মলবাবুর ব্যাপারে আপনি সত্যিই interested. সে দিক দিয়ে সপক্ষে না হলেও পরোক্ষে যে আপনি সন্তোষবাবুর হত্যা ব্যাপারেও interested, তা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে আপনার দ্বিধা নেই?

'আছে! আপনার বন্ধু বা আপনার নিজের অনুমান সম্পূর্ণ ভুল?'

'ভুল!'

'হাঁ!—ভুল।'

'বেশ! আপনার কথাই আপাততঃ মেনে নিয়ে যদি বলি, নির্মলবাবুর গ্রেপ্তারের ব্যাপারটায় আপনি ইচ্ছা করলে— অর্থাৎ যে অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে জড়িত হয়ে নির্মলবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি আমাদের আলো দিতে পারেন, তাহাতেও কি ভুল হবে?

'সুব্রতবাবু! সত্যিই আপনার উকিল হওয়া উচিত ছিল!'

'কেন বলুন ত'?'

'এমন চমৎকার জেরা করতে পারেন এবং লোককে কোন্ ঠাসা করতে পারেন!—'

সুব্রত হেসে ফেলে, তারপর বলে: মিস্ ব্যানার্জী, সত্যিই কি আপনি মুখ খুলবেন না স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বসে আছেন?—'

'মুখ খুললেও আপনাদের এক্ষেত্রে কোন লাভ হবে না, সুব্রতবাবু!—'

'কত সামান্য ব্যাপার থেকেও যে আমরা কত সময় প্রচুর লাভবান হই, তা'ত আপনি জানেন না? জানলে একথা বলতেন না! '

'শুনুন সুব্রতবাবু! মাত্র একটি সর্তে, আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের আমি খোলাখুলি জবাব দিতে প্রস্তুত আছি!—'

'সর্ত !—'

'হাঁ—'

'বলুন কি সর্ত ?'

'যা আমার কাছ থেকে জানবেন, তার সত্যতা নিরুপণের ব্যাপারে আপনি বা আপনার বন্ধু কখনো আমাকে সামনা সামনি, কারো সামনে জেরা করতে পারবেন না ।'

'অর্থাৎ সোজা কথা বলুন—আপনার বক্তব্য একেবারে পুরোপুরি সত্য মেনে নিয়ে, আমাদের সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ বুঁজে থাকতে হবে—কেমন তাই না ?'

'হাঁ !—'

সুব্রত চুপ করে থাকে !

'কি রাজী আছেন ?'

'দেখুন আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই কিন্তু—!'

'আপনার বন্ধু হয়ত রাজী নাও হ'তে পারেন, কেমন এইত ?'

'হাঁ !—'

'কিন্তু আপনার বন্ধু যদি কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যা আজও না বুঝতে পারেন, তা'হলে তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা আর যেই করুক—আমি করতে পারছি না কিন্তু ।'

* * সে রাত্রে সুব্রত কিরীটিকে তার 'তারের' জবাবে ও মৃণালিনীর সংগে যে কথোকথন হয়েছিল তার আলোচনা করে একখানা চিঠি লিখতে বসল ।

কিরীটি,

তোর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে জানবি। দীর্ঘ সময় ধরে মৌসুমকে নানা ভাবে জেরা করে এবং কথাবার্তা বলে এইটুকু বুঝেছি, কবি মৃণালিনী দেবী সন্তোষ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র নির্মল চৌধুরীকে সত্যিই ভালবাসে। তবে চালাক মেয়ে মৃণালিনী, নিজের গোপন দুর্বলতাকে ধরা ছোঁওয়া দিতে চায় না। এখনো বুঝে উঠ্‌তে পারিনি, কেন সে হঠাৎ মধুপুরে গিয়েছিল। তবে সন্তোষ চৌধুরীর মৃত্যু ব্যাপারে, সে জড়িত ইচ্ছাকৃত ভাবে না থাকলেও, ঘটনাচক্রে যে কিছুটা ছিল সে ধারণা আমার নিশ্চিত। জাঁহাবাজ মেয়ে—বোমা মারলেও পেট থেকে কথা বেরুবে না সহজ ভাবে। কাজেই কথার মার প্যাঁচে তাকে কাবু করা যাবে বলে, অন্তত আমার বোধ হয় না। আশার কথা সে বলেছে, যদি তার স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আমরা নিরাপত্তা দিতে পারি, সে মুখ খুলবে—এবং এটাই শেষ কথা তার।

ইতি তোর—সুব্রত।

* * দিন দুই পরে কিরীটির জবাব এলো।

সু,

তোর আগের ও পরের দু'খানা চিঠিই পেয়েছি। এদিকে কতকগুলো সূত্র জট পাকিয়ে গিয়েছিল, তার দু'একটা খুলেছে। মিসেস্ চৌধুরী সম্পূর্ণ না হলেও, কিছুটা মুখ খুলেছেন অর্থাৎ তাঁর একটা নিজ লিখিত ডাইরী পড়ে অনেক কথা জানতে পারা

গিয়েছে। যদিও এখনো তার মধ্যে অনেক কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকেছে। অতীতের যোগসূত্র ধরে অগ্রসর হ'তে গেলেও বাধা আছে। কারণ চারিজনের মধ্যে দু'জন অর্থাৎ সন্তোষ চৌধুরী সুমিত্রার স্বামী ও সুচিত্রা, এ্যাডভোকেট সত্যেন ব্যানার্জীর স্ত্রী আজ দু'জনেই মৃত।

অতীতের সাক্ষী দেবে আজ কেবল সুমিত্রা ও সত্যেন ব্যানার্জী। ওরা চারজনেই একসূত্রে বাঁধা ছিল।

আর একজন পঞ্চম ব্যক্তি, যে ওদের জীবনের সংগে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল এবং অতীতে ওদের বিপ্লব জীবনের সূত্রপাতের মূলে যে ছিল—সেই ১নং বা অরিন্দম—বর্তমান হত্যা রহস্যের ব্যাপারে তারও যোগাযোগ অনেকখানি আছে।

অরিন্দমকে আমরা দেখতে পেয়েছি, ওদের বিপ্লবী জীবনের প্রারম্ভে একটি মুখোসের অন্তরালে। তারপর কিছুদিন ধরে ওদের বিপ্লব জীবনের কার্যকলাপ চলেছে এবং সেই সময় অলক্ষে চলেছিল এক প্রেমের নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র ছিল আমাদের অরিন্দম।

অরিন্দম is a rare specimen. এমন খাঁটি একনিষ্ঠ চরিত্রের লোক বড় একটা দেখা যায় না। অসাধারণ চরিত্র বলের জন্যই একই সময় দু'ধারার দু'টি প্রবল প্রেমকে সে হৃদয়ের মধ্যে জিইয়ে রাখতে পেরেছিল, অনেক দিন ধরে।

কিন্তু সেও মানুষ! যেদিন আকস্মিক প্লাবনে তার কর্মধারাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল, সে একেবারে ডুব দিল দীর্ঘ দিনের জন্য।

এবং সেই অজ্ঞাত বাসের সময় তার যে প্রধান কর্ম প্র.
ব্যর্থতার পীড়নে তা পর্যুদস্ত হ'তে থাকে। শলক

এবং আবার একদিন যখন সে সকলের মধ্যে ফিরে এলো—সে দেখলো—সে আজ ব্যর্থ। কিন্তু একদিন যারা তাকে ঘিরে সৌধ রচনা করতে অগ্রসর হয়েছিল, তারাই আজ যেমন করেই হোক জীবনে কতকটা সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এ আঘাত অরিন্দম সহ্য করতে পারলে না এবং ইতিমধ্যে প্রেমের যুদ্ধেও সে যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে সেটাও সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে।

এই খানেই সুরু হলো বর্তমান নাটক।

মৃণালিনী এই নাটকেরই একটি অপ্রধান চরিত্র। এবারে বোধ হয় মৃণালিনীর গুরুত্ব তুই বুঝতে পারবি। অতএব সাবধানে তাকে যাচাই করে আমাকে জানাবি। প্রয়োজন হলে আমাকে জানাস্। যদিও শীঘ্রই হয়ত আমি এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় আসছি।

ইতি—তোর কিরীটি

—ছয়—

—আবার কোলোপাঞ্জী—

* * চিঠিখানা আগাগোড়া বার দুই পড়ে, সুব্রত তার বর্তমান কর্মপন্থা সম্পর্কে আরো ভাল করে চিন্তা সুরু করে।

আজ সাত আট দিন ধরে প্রায়ই মৃণালিনীর সংগে আলাপ করে—নানা কথাবার্তা বলে, বলতে গেলে ও কিছুই অগ্রসর হতে পারেনি।

মৃণালিনীর কঠিন চারিত্রিক লৌহ বর্মে ঠেকে, ওর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে আজ পর্যন্ত।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই মৃণালিনীর কাছে ও আজ সত্যিই পরাজিত।

আজই একবার সন্ধ্যাবেলা আবার ও মৃণালিনীর সংগে দেখা করবে। এদিকে মৃণালিনীর পিতা রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জীও এখনো কলকাতায় ফিরে আসেন নি।

লোকটা হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই দুম করে লাহোরে প্রস্থান করলো'মেয়ের অনুপস্থিতিতে, এইবা কি রকম ?

মৃণালিনীও যে তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে বিশেষ চিন্তিত তাও ত' বলে মনে হয় না।

আবার সেই কালো পাঞ্জা !

দু'চার মিনিট সুব্রত সেই মৃতদেহটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পায়ে বোধ হয় জাপানী ঘাসের চটি ছিল, অদূরে তার এক পাটি ছিটকে পড়ে আছে।

ঘরের চতুর্দিকে সুব্রত একবার দৃষ্টি বুলায় কোন কিছু অস্বাভাবিকই নজরে পড়ে না।

অদূরে পালংকের পরে শয্যাটি দেখে মনে হয় শয্যাটি গত রাত্রে ব্যবহৃত হয়নি।

মৃত্যুর উলংগ বীভৎস প্রকাশ।

সুব্রত জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল : গরাদহীন বেশ প্রশস্ত জানালা। জানালা পথে তাকালে নীচে দেখা যায় একটা পার্ক। পার্ক ও এ বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান ছোট্ট একটি সরু গলি পথ। পার্কের চতুঃসীমানার যে প্রাচীর তার উচ্চতা নেহাৎ কম হবে না।

পার্কের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে এ বাড়ীর জানালার নাগাল পাওয়া যায় না। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় সুব্রত জানালাটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করতে থাকে। বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না।

জানালার গায়ে রং অনেক দিন আগে দেওয়া হয়েছে। এবং এ বাড়ী ঝাড়া পোঁছাটা যে বেশ নিয়মিত ভাবেই হয় তা চারিদিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হয় না।

কতকগুলো আঁচড়ের দাগের মত জানালার গায়ে দেখতে পাওয়া ছাড়া বিশেষ আর কিছুই সুব্রতর নজরে পরে না।

তালুকদার তখন স্থানীয় থানা ইনচার্জ রমেশবাবুকে প্রশ্ন করছিল।

'ভিতর থেকে দরজা তাহলে বন্ধই ছিল রমেশবাবু ?'

'হ্যাঁ স্যার ! আমরা আসবার পর দরজা ভাংগা হয়েছে।'

'থানায় খবর দিয়েছিল কে ?'

'এ বাড়ীর দারোয়ান।'

এবারে সুব্রত প্রশ্ন করে : আচ্ছা রমেশবাবু মৃতদেহের Position এখন যা দেখছি দরজা ভেংগে আপনারা যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখনও ঠিক এমনিই ছিলত' ?'

'হ্যাঁ ঠিক ঐ Positionয়েই বরাবর আছে।'

'আচ্ছা সামনের ঐ জানালাটা যে খোলা দেখা যাচ্ছে, ওটা কি অমনি খোলাই ছিল ?'

'হ্যাঁ !'

'বাড়ীর লোকদের জবানবন্দী নিয়েছেন ?' প্রশ্ন করে তালুকদার।

'আজ্ঞে বাড়ীতে বিশেষ কেউ নেই। মৃত রায়বাহাদুরের একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী দেবী, একজন দাসী, জন চারেক ভৃত্য, বামুন, সোফার, মালি, দারোয়ান আর একজন সরকার আছেন সুখেন্দু রানা ! চাকর বাকরদের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে বাকী আছে !—'

'মৃণালিনী দেবীর জবানবন্দী ?'

'হাঁ।'

'তাঁর সংগে দেখা হয়েছে ?'

'হয়েছে।'

'তিনি কোথায় ?'

'তিনি তাঁর নিজের ঘরে আছেন—বলেছেন, প্রয়োজন হলে যেন সেখানে যাই।'

'বেশ ! তা জবানবন্দীতে কতদূর কি জানতে পেরেছেন !'

'গতকাল দুপুরে রায়বাহাদুর পাঞ্জাব একস্‌প্রেসে লাহোর থেকে ফিরেছেন। সমস্ত দিন বাড়ী থেকে কোথাও বের হননি। সন্ধ্যার দিকে তাঁর নিজের ঘরে বসে বাপ ও মেয়েতে অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথাবার্তা হয়। রাত্রি গোটা দশেকের সময় রায়বাহাদুর আহারাদি করে এই ঘরে শুতে আসেন। রাত্রে কোন রকম চীৎকার বা অস্বাভাবিক শব্দ কেউ কিছু শোনেনি বা এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাতে করে সন্দেহ হতে পারে। খুব ভোরে রায়বাহাদুরের কি শীত কি গ্রীষ্মে স্নান করার অভ্যাস নিয়মিত। ভৃত্য সেই জন্য প্রত্যহ ভোরে এসে রায়বাহাদুরের স্নানের যাবতীয় সরঞ্জাম ঠিক করে রেখে যায়। আজও ঠিক করতে এসে দেখে ঘরের দরজা তখনও ভিতর হতে বন্ধ! অথচ ও সময়ের আগেই চিরদিন রায়বাহাদুর ঘরের দরজা খুলে রাখেন। ভৃত্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, ক্রমে যখন ছয়টা বেজে যায় তখন সে দরজায় ধাক্কা দেয়। কিন্তু কোন

সাড়া শব্দই না পেয়ে ও আরো দু'চারবার বেশ জোরের সংগেই দরজায় ধাক্কা দেয়। তবু কোন সাড়াশব্দ মেলে না। ক্রমে ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে ডাকাডাকি স্থরু করে। ডাকাডাকি করেও যখন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন ওরা ভয় পেয়ে রায়বাহাদুরের মেয়েকে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। মৃণালিনী দেবী এসে অনেক ডাকাডাকি ও দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও কোন সাড়াশব্দ পান না।

নীচ থেকে স্থখেন্দুবাবুকে সংবাদ দিয়ে উপরে ডেকে আনা হয়। তিনিই কোন কিছু অঘটন ঘটেছে সন্দেহ করে তখুনি দারোয়ান পাঠিয়ে থানায় সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়েই আমি এখানে এসে দরজা ভেংগে ঐ দৃশ্য দেখতে পাই।'

খুনী বা আততায়ী তাহলে ঘরে কোন পথেই বা এলো এবং কোন পথেই বা অদৃশ্য হয়ে গেল ?

মৃতদেহের পৃষ্ঠদেশের ঠিক মধ্যখানে ছোরাটা প্রায় সমূলে বিঁধে আছে এতে করে বুঝতে কোন কষ্টই হয় না ব্যাপারটা হত্যা !

কোন নৃশংস আততায়ীর নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতেই রায়বাহাদুরের মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু ঘরে প্রবেশ ও নির্গমের জন্য একটি মাত্র দরজা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথই নেই।

কক্ষ সংলগ্ন স্নান ঘরে ঢুকবার জন্য কক্ষ মধ্যস্থিত দরজাটি ছাড়াও অবিশ্যি বাইরের দিকে একটা ছোট দরজা আছে

ম্যাথরদের যাতায়াতের জন্য। কিন্তু সে দরজাটাও ভিতর থেকে খিল তোলা।

তবে কোন পথে আততায়ী এলো এবং কোন পথেই বা অদৃশ্য হলো!

সমগ্র রহস্যের একটি মাত্র মীমাংসার সূত্র হ'তে পারে ঐ খোলা জানালাটি!

কিন্তু ঐ জানালা পথে কোনক্রমে নির্গম সম্ভবপর হলেও প্রবেশের সুবিধাত' নেই!

তবে এক যদি হয় আততায়ী আগে হতেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে আত্মগোপন করে রেখেছিল এবং পরে সময় বুঝে কার্য হাসিল করে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়েছে।

এবং তাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, খুনী সহজ ভাবে দরজা পথে না গিয়ে অন্য কষ্টসাধ্য পথে যাবে কেন? এতে করেই অনুমান করা যায় নিশ্চয়ই আগে থাকতে আততায়ী এ কক্ষের মধ্যে এসে আত্মগোপন করে ছিল না।

তাই যদি না থাকবে তাহলে কি ভাবে, কোন পথে সে কক্ষ মধ্যে এসে প্রবেশ করল?

আরো একটা কথা : মৃতদেহ ওভাবে জানালার ঠিক নীচেই বা পড়ে আছে কেন?

তা'হলে কি ঐ খোলা জানালার সংগেই হত্যার কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে?

শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেও বোঝা যায় রাত্রে শয্যা কেউ

ব্যবহার করেনি। এতে স্পষ্টই মনে হয় হত্যা ব্যাপারটা শয়নের পূর্বেই ঘটেছে। রাত্রি দশটার পর আহারাদি শেষ করে রায়বাহাদুর যখন শয়নকক্ষে এসেছেন তখন রাত্রি এগারটা কি সাড়ে এগারটার মধ্যেই খুব সম্ভবত হত্যা ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে।

'কালোপাঞ্জার' ছাপ থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় হত্যাকারী কালোপাঞ্জা ছাড়া আর কেউ নয় এবং বোধ হয়ত একই কারণে এ হত্যাটি হয়েছে।

কিরীটির শেষ চিঠির সারাংশ হ'তে প্রমাণিত হচ্ছে: সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা ও রায়বাহাদুর ব্যানার্জীর হত্যা এক সূত্রে গাঁথা!

একটার পর একটা চিন্তাগুলো সুব্রতর মাথার মধ্যে ভেসে যায়।

কিন্তু এবারে মৃণালিনীর সংগে দেখা করা বিশেষ প্রয়োজন!

—সাত—

—কালো মেঘ—

হঠাৎ তালুকদারের প্রশ্নে সুব্রত ফিরে তাকায়।

'মৃতের নাইট গাউনের 'পরে একটা কিসের ছাপ দেখছো সুব্রত ?—'

'হাঁ। দেখেছি 'কালোপাঞ্জার' নিদর্শন !'

'কালোপাঞ্জার নিদর্শন ? '

'দেখতে পাচ্ছোনা—ভাল করে চেয়ে দেখো !'

ঝুঁকে পড়ে আর একবার ভাল করে দেখে তালুকদার বলে : সত্যিইত ! একটা পাঞ্জারই ছাপই' বটে ? আশ্চর্য ! তবে কি ?—'

'হাঁ ! নিঃসন্দেহে ! এও কালোপাঞ্জারই কীর্তি !'

'তাহলে ?'

'তাহলে বুঝতেই পারছ মধুপুরের মাধবী ভিলায় সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা, মধুপুর ময়দানে শংকর নারায়ণের হত্যা ও কলকাতায় এই রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জীর হত্যা সব একই সূত্রে গাঁথা ! সব গুলোই শ্রীযুক্ত 'কালোপাঞ্জা' নামধারী কোন কীর্তিমানের অবিস্মরণীয় কীর্তি !

'বলকি! খবরের কাগজে পড়ছিলাম কিরীটি মধুপুরে গিয়েছে সন্তোষ চৌধুরীই হত্যার ব্যাপারে। তাহলেত' ব্যাপারটা বেশ জটীল বলেই মনে হচ্ছে!—'

'সন্দেহ কি তাতে আর! আচ্ছা তুমি ততক্ষণ এদিককার ব্যাপারগুলো সেরে ফেল, আমি একবার মৃণালিনী দেবীর সংগে দেখা করে আসি!—'

'বেশ যাও! তোমার সংগে কিন্তু কথা আছে সুব্রত—'

'এক সংগেই ফিরবোখন!—'

সুব্রত কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * *

মৃণালিনীর কক্ষ!

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে সুব্রত কক্ষে প্রবেশ করল।

খোলা জানালা পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৃণালিনী একখানা চেয়ারের পরে কোলের 'পরে দুটি হাত ন্যস্ত করে বসে আছে—নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত!

একটু আগেও হয়ত কাঁদছিল দু' চোখের কোলে তার সুস্পষ্ট অশ্রু চিহ্ন!

মাথার অজস্র চুল দু'কাঁধের 'পর দিয়ে বুকের পরে এসে পড়েছে! গায়ের কাপড় অসংলগ্ন।

'মৃণালিনী দেবী?—'

চমকে সুব্রতর ডাকে মৃণালিনী ফিরে তাকাল।

সুব্রত আরো কাছে এগিয়ে এলো।

সহসা মৃণালিনীর দুই চক্ষুর কোল ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

দু'হাতে মৃণালিনী মুখ ঢাকল।

দশ আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর মৃণালিনী যেন অনেকটা শান্ত হলো।

'এই দুঃখের সময় আপনাকে ভেংগে পড়লেত' চলবে না মৃণালিনী দেবী! শক্ত হ'তে হবে।'

'বাবা! এ জগতে যে আর আমার কেউ নেই সুব্রতবাবু। '

'কি করবেন বলুন? নিয়তিকে ত' রোধ করতে কেউ পারে না মৃণালিনী দেবী!—'

'আমি! আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না সুব্রতবাবু-বাবা! আমার বাবা আর নেই! এ সংসারে আমি আজ একা! একেবারে একা! কাল রাত্রে বাবা যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যান তখনও যে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এত বড় সর্বনাশ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটবে।

এ আমার কি হলো! কি হলো?'

আহা বেচারী সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছে।

আঘাত পাবারই ত' কথা।

সুব্রতর মনটাও যেন ব্যথায় বিষণ্ণ হ'য়ে গিয়েছে।

সামান্য একটা দিনের পরিচয় ও ঘনিষ্টতায় সত্যিই ওর বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে।

'বলকি ! খবরের কাগজে পড়ছিলাম কিরীটি মধুপুরে গিয়েছে সন্তোষ চৌধুরীই হত্যার ব্যাপারে। তাহলেত' ব্যাপারটা বেশ জটীল বলেই মনে হচ্ছে !—'

'সন্দেহ কি তাতে আর ! আচ্ছা তুমি ততক্ষণ এদিককার ব্যাপারগুলো সেরে ফেল, আমি একবার মৃণালিনী দেবীর সংগে দেখা করে আসি !—'

'বেশ যাও ! তোমার সংগে কিন্তু কথা আছে সুব্রত—'

'এক সংগেই ফিরবোখন !—'

সুব্রত কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ।

* * *

মৃণালিনীর কক্ষ !

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে সুব্রত কক্ষে প্রবেশ করল।

খোলা জানালা পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৃণালিনী একখানা চেয়ারের পরে কোলের 'পরে তুটি হাত ন্যস্ত করে বসে আছে— নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত !

একটু আগেও হয়ত কাঁদছিল তু' চোখের কোলে তার সুস্পষ্ট অশ্রু চিহ্ন !

মাথার অজস্র চুল তু'কাঁধের 'পর দিয়ে বুকের পরে এসে পড়েছে ! গায়ের কাপড় অসংলগ্ন।

'মৃণালিনী দেবী ?—'

চমকে সুব্রতর ডাকে মৃণালিনী ফিরে তাকাল ।

সুব্রত আরো কাছে এগিয়ে এলো।

সহসা মৃণালিনীর দুই চক্ষুর কোল ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

দু'হাতে মৃণালিনী মুখ ঢাকল।

দশ আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর মৃণালিনী যেন অনেকটা শান্ত হলো।

'এই দুঃখের সময় আপনাকে ভেংগে পড়লেত' চলবে না মৃণালিনী দেবী! শক্ত হ'তে হবে।'

'বাবা! এ জগতে যে আর আমার কেউ নেই সুব্রতবাবু।'

'কি করবেন বলুন? নিয়তিকে ত' রোধ করতে কেউ পারে না মৃণালিনী দেবী!—'

'আমি! আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না সুব্রতবাবু-বাবা! আমার বাবা আর নেই! এ সংসারে আমি আজ একা! একেবারে একা! কাল রাত্রে বাবা যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যান তখনও যে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এত বড় সর্বনাশ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটবে।

এ আমার কি হলো! কি হলো?'

আহা বেচারী সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছে।

আঘাত পাবারই ত' কথা।

সুব্রতর মনটাও যেন ব্যথায় বিষণ্ণ হ'য়ে গিয়েছে।

সামান্য একটা দিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সত্যিই ওর বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে।

'বলকি! খবরের কাগজে পড়ছিলাম কিরীটি মধুপুরে গিয়েছে সন্তোষ চৌধুরীই হত্যার ব্যাপারে। তাহলেত' ব্যাপারটা বেশ জটীল বলেই মনে হচ্ছে!—'

'সন্দেহ কি তাতে আর! আচ্ছা তুমি ততক্ষণ এদিককার ব্যাপারগুলো সেরে ফেল, আমি একবার মৃণালিনী দেবীর সংগে দেখা করে আসি।—'

'বেশ যাও! তোমার সংগে কিন্তু কথা আছে সুব্রত—'

'এক সংগেই ফিরবোখন।—'

সুব্রত কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * *

মৃণালিনীর কক্ষ!

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে সুব্রত কক্ষে প্রবেশ কবল।

খোলা জানালা পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৃণালিনী একখানা চেয়ারের পরে কোলের 'পরে দুটি হাত ন্যস্ত করে বসে আছে—নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত!

একটু আগেও হয়ত কাঁদছিল দু' চোখের কোলে তার সুস্পষ্ট অশ্রু চিহ্ন!

মাথার অজস্র চুল দু'কাঁধের 'পর দিয়ে বুকের পরে এসে পড়েছে! গায়ের কাপড অসংলগ্ন।

'মৃণালিনী দেবী?-'

চমকে সুব্রতর ডাকে মৃণালিনী ফিরে তাকাল।

সুব্রত আরো কাছে এগিয়ে এলো।

সহসা মৃণালিনীর দুই চক্ষুর কোল ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

দু'হাতে মৃণালিনী মুখ ঢাকল।

দশ আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর মৃণালিনী যেন অনেকটা শান্ত হলো।

'এই দুঃখের সময় আপনাকে ভেংগে পড়লেত' চলবে না মৃণালিনী দেবী! শক্ত হ'তে হবে।'

'বাবা! এ জগতে যে আর আমার কেউ নেই সুব্রতবাবু। '

'কি করবেন বলুন? নিয়তিকে ত' রোধ করতে কেউ পারে না মৃণালিনী দেবী !—'

'আমি! আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না সুব্রতবাবু-বাবা! আমার বাবা আর নেই! এ সংসারে আমি আজ একা! একেবারে একা! কাল রাত্রে বাবা যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যান তখনও যে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এত বড় সর্বনাশ এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটবে।

এ আমার কি হলো! কি হলো?'

আহা বেচারী সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছে।

আঘাত পাবারই ত' কথা।

সুব্রতর মনটাও যেন ব্যথায় বিষণ্ণ হ'য়ে গিয়েছে।

সামান্য একটা দিনের পরিচয় ও ঘনিষ্টতায় সত্যিই ওর বড় ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে।

একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহজ কৌতুক ও আনন্দ প্রিয় হাসি-খুশি স্বভাবটিও ওর সুব্রতকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল ওর প্রতি !

'আচ্ছা কোন রকম শব্দ বা অস্বাভাবিক কিছুই আপনি শুনতে পাননি ?—'

'না বিকালের দিকে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম রাত্রি প্রায় সাতটায় ফিরি। ফিরতেই বাবা তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। অনেকক্ষণ ধরে বাবার সংগে গল্প করে দু'জনে খেতে গেলাম 'মৃণালিনীর কথাটা শেষ হলো না।

বাইরে কার দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই দ্রুতপদে যে এসে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে সুব্রত সত্যিই আশ্চর্য হয়ে ওঠে : একি অনিলবাবু ? '

মৃণালিনী দেবীও কম আশ্চর্য হননি তিনিও বলেন : একি অনিলদা ! '

'হাঁ ! সকালের ট্রেনেই কলকাতায় নেমে সোজা এখানে আসছি কিন্তু বাড়ীতে ঢুকেই—'

আবার মৃণালিনীর দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নামে।

অনিলবাবুর চোখও জলে ভরে ওঠে।

'দিদিমা এ সংবাদ শুনলে তাঁকে আর বাঁচান যাবে না সুব্রতবাবু ! আঘাত খেয়ে খেয়ে গত কয়েক বছর ধরে তাঁর যে অবস্থা হয়েছে !' অনিলবাবু বলতে লাগলেন : মামাবাবু

দিদিমার ঐ একমাত্র সন্তান! পাঁচ পাঁচটি ছেলে অল্প বয়সে মরে যাওয়ার পর ঐ একটিই বেঁচে ছিল!

উপযুর্পরি এতগুলো শোক তাপে জর্জরিত, তার 'পরে এই চরম আঘাত এ বয়সে যে দিদিমা সহ্য কি করে করবেন আমি তাই ভাবছি!—'

'ওসব কথা এখন থাক অনিলবাবু! একে উনি অত্যন্ত মুষড়ে পরেছেন—' সুব্রত অনিলবাবুকে বাধা দেয়।

'তাত' নিশ্চয়ই! তাত' নিশ্চয়ই! ' অনিলবাবু বলে ওঠেন।

'আমি সন্ধ্যার দিকে আবার আসব মিস্ ব্যনার্জী! এখন উঠলাম! ' বলে অনিলবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে সুব্রত বললে: ওকে দেখবেন অনিলবাবু।

সুব্রত কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

তালুকদার মৃতদেহ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করতে বলে আপাততঃ সুব্রতকে সংগে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

কথায় কথায় সুব্রত জিজ্ঞাসা করে: 'কালোপাঞ্জা'র নাম তাহলে তুমি শোননি?

'সেদিন বিহার স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ রিপোর্টে দেখছিলাম মধুপুরের 'মাধবী ভিলার'. সন্তোষ চৌধুরীর হত্যা ব্যাপারে তাঁরও জামার 'পরে পৃষ্ঠদেশে নাকি একটি 'কালোপাঞ্জার' ছাপ দেখা গেছে এবং পরের দিন তাঁর বাড়ীর সন্নিকটবর্তী মাঠের মধ্যে যে

অজ্ঞাত মৃতদেহটি পাওয়া গেছে তারও পৃষ্ঠদেশে অনুরূপই 'কালোপাঞ্জা'র ছাপ ছিল।'

'হাঁ! কিরীটির ধারণা মধুপুরের হু'টি হত্যাব্যাপারই একই সূত্রে গাঁথা।'

'কিন্তু এই 'কালোপাঞ্জা'টি কে?'

'আসল রহস্যইত সেখানে, ঐটুকু জানতে পারলেইত সমস্ত হত্যা ব্যাপার গুলোরই মীমাংসা হয়ে যায়।' সুব্রত মৃদু হেসে বলে।

'আহা! সেত' আমিও জানি! আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে তুমি বা কিরীটি সে সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছো নাকি?'

'কিরীটির কথা যদি জিজ্ঞাসা করো সেত' তুমি জানই কোন একটা রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারকে হাতে নেওয়ার পর যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা মীমাংসায় এসে সে পৌঁচেছে কখনো কোন মতামত প্রকাশত' দূরে থাক মুখই খোলে না। আর আমার কথা হচ্ছে পরপর তিনটি নৃশংস হত্যার মূল সূত্র যেখানেই থাকুক না কেন এইটুকু আমি বুঝতে পারছি আপাততঃ যে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডগুলোর পিছনেই আছে কোন একটি ব্যক্তি বিশেষের উন্মাদ প্রতিহিংসা চরিতার্থতার নৃশংস প্রচেষ্টা!'

'কিন্তু এই কালোপাঞ্জা?'

'ওটা কিছু না। ব্যক্তি বিশেষের একটা কমপ্লেকস্ মাত্র! বলতে পারো ভ্যানিটি কমপ্লেকস্।—'

'বুঝলাম। কিন্তু বর্তমানে তুমি এ বাড়ীতে যাতায়াত করছ

কেন? যারা তোমাকে ভাল করে জানে না তারা হয়ত বলবে রায়বাহাদুরের সুন্দরী তন্বী কন্যাটির আকর্ষণে তুমি ঘোরাফেরা করছো কিন্তু আমি তো জানি—!'

তালুকদারের কথা শেষ হয় না, সুব্রত হো হো করে হেসে উঠে বলে, নাইবা কে বললে? আমিওত' মানুষ!'

'থাক ভাই! ওইটিই আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না সত্যিই তুমি মানুষ, মানে পুরুষ মানুষ কিনা?'

'দেখ ভাই! ঠিক তা নয়, ঐ বিবাহ ব্যাপারটাকেই আমি রীতিমত ভীতির চোখে দেখি। কিন্তু যাকগে ওসব কথা, তোমার কথারই জবাব দিই। মধুপুরের হত্যারহস্যের ব্যাপারেই আমি এ বাড়ীতে কয়েক দিন যাবৎ যাতায়াত করছিলাম।—'

'কেন? এঁদের সংগে সে হত্যার কি সম্পর্ক আছে?—'

'সম্পর্ক যে একটা কিছু ছিল তার প্রমাণত' তুমি একটু আগে নিজ চোখেই দেখে এলে। আরো বিশদ ভাবে যদি জানতে চাও তার জবাব হচ্ছে: নিহত সন্তোষ চৌধুরীর স্ত্রীর সংগে এ বাড়ীর একটা কিছু যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে বলে আমার মনে হয়, যদিও তার সঠিক প্রমাণ আমি এখনও পাইনি। এবং সন্তোষ চৌধুরী যে রাত্রে নিহত হন আমার ধারণা মৃণালিনী দেবী সে রাত্রে মাধবী ভিলার আশেপাশে কোথাও ছিলেন। আর তার একদিন পরেই হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় পালিয়ে এসেছেন। সে কারণে

কিরীটি মৃণালিনী দেবীর 'পরে বেশ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।'

'হুঁ! এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম!'

'এখানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দেখলাম রায়বাহাদুর' সত্যেন ব্যনার্জী আমি এখানে পৌঁছাবার পূর্বেই অকস্মাৎ লাহোরে অন্তর্ধ্যান করেছেন এবং তাঁর মেয়েটি কৌতুক রহস্যে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠেছে ।'

'তারপর?'

'তারপর আজ সকালে এই রূঢ় আঘাত! অকস্মাৎ লাহোরে অন্তর্ধ্যান করে কলকাতায় ফিরে পা দিতে না দিতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নিহত।'

'এখন ভেবে মরো কেনইবা হঠাৎ লাহোরে গেলেন' এবং তারপর একটু থেমে আবার বলে 'ফিরে আসবার সংগে সংগেই বা কেন নিহত হলেন?'

'মেয়েও তাঁর জানেনা কেন হঠাৎ রায়বাহাদুর লাহোরে গিয়েছিলেন?'

'জানেনা বলেই এখনো আমার বিশ্বাস, তবে জানলেও যে সহজে এখন আর সে কথা তার কাছ থেকে জানা যাবে তাও বলে মনে হয় না।'

'ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে তাহলে বলো?—'

'গোলমেলে নিশ্চয়ই! কিন্তু আমার আর এসব ভাল লাগছে না। এদিকে ছুটিটাও ফুরিয়ে এলো, কথায় আছে না

কালোপাঞ্জা

শান্ত নিরুপদ্রব জীবন যাত্রার মাঝখানে যে দুঃস্বপ্নের কালো ঝঞ্ঝা নেমে এসেছে অতর্কিতে চারিদিক আঁধার করে।

নির্মল ! নির্মল হয়েছে গ্রেপ্তার ঃ কারাগৃহের লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে পিতৃহত্যার কলংক মাথায় নিয়ে নিদারুণ মর্ম পীড়ায় হয়ত প্রতিটি প্রহর গুণছে।

সংসারের একমাত্র আশ্রয়-স্নেহের উৎসটিও আজ তার জীবন থেকে অবলুপ্ত।

একি হলো তার ? একি হলো ?

—আট—

—নির্মল চৌধুরী—

এই কিছুক্ষণ আগে মাত্র কিরীটি সুব্রতর দীর্ঘ তার বার্তা পেয়েছে।

রায় বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জী বিখ্যাত এ্যাড্‌ভোকেট ও কাউন্সিলার নিহত এবং তারও পৃষ্ঠদেশে ছিল 'কালোপাঞ্জার' সুস্পষ্ট ছাপ।

আততায়ী অমানুষিক ঔদ্ধত্য জানিয়েছে আবার: দেখো আমার মৃত্যু পরশ কত অমোঘ!

মৃণালিনী সম্পর্কে যা সুব্রত জানিয়েছে তাও মোটেই আশা-প্রদ নয় এবং এ ব্যাপারের পর সহজে যে সে মুখ খুলবে তাও' আদপেই মনে হচ্ছে না। ঘটনা চক্র সহসা যেন কুটীল আবর্ত রচনা করলে।

আরো একটা বিশেষ সংবাদ যা ঐ তার বার্তা থেকে ও জেনেছে একদিক থেকে সেটা যেমন হত্যাকারীর হত্যার ব্যাপারে অনুকূল তেমনি আগের মতই এখনো সেটা হয়ে ত... ধোঁয়াটে অস্পষ্ট! ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

একটি! মাত্র একটি সূত্রের মীমাংসা! ...ার!

সমগ্র ব্যাপারটা একেবারে ছক্ কেটে এগিয়ে এসে এখ বিমল সে বাধা পাচ্ছে বার বার! ঐ একটি! ঐ একটি জায়গাতেই খরস্রোতা নদী আগাগোড়া দীর্ঘ পথ একটানা বয়ে এসে হঠাৎ রচনা করেছে একটা ঘূর্ণাবর্ত!

সমস্ত বিশ্লেষণ সমস্ত যুক্তিকে যেন ঘূর্ণাবর্ত আপন বিবরে টেনে নিয়ে চলেছে।

মিসেস্ চৌধুরীর সংগে এখন কোন আলোচনা করেও ফল নেই। একমাত্র পুত্রের আকস্মিক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যেন তিনি বিশেষ রকম মুষড়ে প'ড়েছেন।

যে শক্তির জোরে তিনি একটানা দীর্ঘকাল ধরে একান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও সংগ্রাম করে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; আজ যেন হঠাৎ সেই শক্তির মূলেই চরম আঘাত লেগেছে।

নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েও তিনি কোন মতে দাঁড়িয়েছিলেন। পুত্রকে নিয়ে জড়িত দুর্ঘটনার আঘাতটা আর তিনি সামলাতে পারলেন না।

অন্তরের যে তীব্র স্নেহ ও প্রেম একদিন তাঁর স্বামীকে নিয়ে চির সুখের নীড় রচনা করতে উৎসুখ হ'য়ে উঠেছিল: যে স্বামীর আদর্শের স্বপ্নকে ঘিরে তাঁর নারীত্ব একদিন বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল সেই স্বপ্ন যেদিন চুরমার হ'য়ে গেল, সুখের নীড় বালুর প্রাসাদের মত ভেংগে গুড়িয়ে গেল, অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও প্রেম ভিন্ন ধারা নিল। একমাত্র পুত্রকে সে তখন চারিদিক থেকে আঁকড়ে ধরলো। এবং আজ যখন সেই একমাত্র স্নেহের

..র পুত্র নির্মল হীন খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলো। সুমিত্রার সমস্ত মানসিক শক্তির হলো অবসান ।

সুমিত্রা আজ মৃতা !

তার অস্তিত্বই মাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু প্রাণ নেই !

অথচ এখন একমাত্র সেই কিরীটিকে সাহায্য করতে পারে !

এদিকে কিরীটি কারাগারে নির্মল চৌধুরীর সংগে একবার সাক্ষাৎ করবার জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু হংসরাজ বাধা দিয়েছে।

আত্মীয় ও পুলিশের কর্মচারী ছাড়া আর কাউকেই সে কারাগারে নির্মল চৌধুরীর সংগে দেখা করতে দেবে না ; বিশেষ করে প্রথম হতেই কিরীটির 'পরে সে যখন প্রসন্ন নয়। কিরীটি মুখে কোন প্রতিবাদ না করে গোপনে কলকাতার পুলিশ বিভাগে একটা জরুরী চিঠি লিখেছে যাতে সেখান থেকে বিহার সরকারের কাছে একটা সাক্ষাতের জন্য অনুমতি পত্রের জন্য সুপারিশ করা হয়।

আপাততঃ এখন কারাগারে নির্মলের সংগে দেখা করে কয়েকটা কথা তাকে জানতেই হবে।

মধুপুর ত্যাগের পূর্বে তাকে যেমন করেই হোক একটিবার নির্মল চৌধুরীর সংগে সাক্ষাৎ করতেই হবে।

ইতিমধ্যে একদিন মিসেস্ চৌধুরী কারাগারে ছেলের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানা গেছে মা ও ছেলের সংগে বিশেষ তেমন কোন কথাবার্তা হয়নি।

মৃত সন্তোষ চৌধুরীর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী সুবিমল শীলের সাহায্যে কিরীটি একবার চেষ্টা করেছিল নির্মল চৌধুরীকে যাতে জামিনে খালাস করিয়ে আনা যায়, কিন্তু সরকারী মহলে হংসরাজের প্রতিপত্তিটা একটু বিশেষ রকম থাকায় তাতেও সে সফলকাম হ'তে পারেনি।

কলকাতার কাজ করবার দেখাশোনা করা প্রয়োজন সুবিমল কলকাতায় চলে গিয়েছে।

* * *

আরো দিন চারেক পরের কথা

কিরীটি তার নির্দিষ্ট ঘরটিতে বসে একটা ইংরাজী ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ছিল। বাইরে পরিচিত জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ পাওয়া গেল। কিরীটির চোখে মুখে চাপা হাসির বিদ্যুৎ যেন খেলে যায়। একবার কোন বিশেষ একটি জুতোর শব্দ শুনলে এবং তার মধ্যে যদি কোন বিশেষ বৈচিত্র্য থাকে কিরীটির কোন দিনই আর সে শব্দ চিনতে ভুল হয় না।

স্থানীয় থানার দারোগা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণবাবু আসছেন এবং কেন যে এ সময় আসছেন অনুমান করতে কিরীটির কষ্ট হয় না।

সত্যিই! শ্যামাচরণ বাবুই এসে ঘরে প্রবেশ করলেন: নমস্কার! ওর নাম কি ,কিরীটিবাবু শুনছেন! নমস্কার!

কিরীটি ইচ্ছা করেই প্রথমটায় শ্যামবাবুর দিকে বই থেকে চোখ তুলে তাকায়নি-যদিও মনটা তার ওদিকেই ছিল। এবারে

শ্যামবাবুর সুস্পষ্ট আহ্বানে মুখ তুলে তাকাল : নমস্কার !

'নমস্কার ! ওর নাম কি আপনিত' সাংঘাতিক লোক মশাই !'

'কেন বলুন ত' ?' কিরীটি সহাস্য প্রশ্ন করে।

'ওর নাম কি ! সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত 'পারমিশন' এনে তবে ছাড়লেন ?'

'পারমিশন ! কিসের ?' ব্যাপারটা যেন ঘুণাক্ষরেও কিরীটি জানেনা এই ভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ্যামবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'জানেন না বুঝি ! ওর নাম কি তাহলে আপনি এখনো সে অর্ডারের কপি পান নি ?'

'অর্ডার ! কিসের অর্ডারের কপি বলুন ত'

'আপনি যে কোন দিন গিয়ে হাজতে—'

'হাজতে ! কেন ?'

'মানে ওই যে আপনি নির্মল চৌধুরীর সংগে দেখা করতে চান না ?'

'ওঃ !'

'কবে যাবেন বলুন ? ওর নাম কি আমি সংগে করে নিয়ে যাবো আপনাকে আমার 'পরে সেই আদেশই আছে পুলিশ কমিশনারের !'

'শুনে সুখী হলাম ! তবে আজ বিকালের দিকেই যাবো। সেই ভাবেই ব্যবস্থা করবেন। আর একটা কথা এই দেখা শোনার ব্যাপারটা মিঃ চৌধুরীর সংগে একান্ত গোপনীয় তাঁর

এবং আমার মধ্যে। কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে মানে আশপাশেও কেউ থাকতে পারবে না।'

'মিঃ চাকলাদার কি তাতে রাজী হবেন ?'

মুহূর্তে যেন কিরীটি দপ্ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু অন্তরের উষ্মা চেপে রেখে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় : শুনুন শ্যামবাবু আপনাদের মিঃ চাকলাদারকে জানিয়ে দেবেন ঠিক আমি যে ভাবে বললাম সেই ভাবে যদি মিঃ চৌধুরীর সংগে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয়ত' দেখা করবো নচেৎ তাঁর সংগে আমি দেখা করবো না।

'লোকটা বড় সাংঘাতিক ! আপনার ভালর জন্যই বলছিলাম না হলে কি নিজের বাপকে খুন করতে পারে '

'প্রথমতঃ তিনি তার বাপকে যে খুন করেননি আপনাদের মগজে এতটুকু পদার্থ থাকলেও সেটা বুঝতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ যত বড় সাংঘাতিক চরিত্রেরই মানুষ হোক না কেন সাক্ষাৎ করতে আমি কারো সংগেই ডরাই না ! '

'মানে, ওর নাম কি আপনার এখনও ধারণা নাকি নির্মল চৌধুরী তার পিতাকে খুন করেন নি ?'

নিশ্চয়ই ! তাছাড়া সে ধারণা বদলাবার মতও এখন পর্যন্ত কোন্ কারণইত' ঘটে নি। আপনারা মিথ্যে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে অযথা পীড়ন করছেন। এটা বোঝেন না কেন বাপের সংগে পুত্রের যদি মতেরই অমিল থাকে আমাদের বাংলা দেশের কোন ছেলে তার বুড়ো বাপকে সেই তুচ্ছ কারণে

খুন করতে পারে না। This is not your Europe! আপনারা তাকে খুনী বলে দাঁড় করিয়াছেন খুনের কোন motive বা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন কি? কতকগুলো circumstantial evidence তার ওপরে মাত্র নির্ভর করে খুনী বলে কাউকে অপরাধী প্রমাণ করান এত সহজ নয় শ্যামবাবু! আপনাদের হাতে আইন আছে ও আইনের শক্তি আছে যার অযৌক্তিক জোরে অনায়াসেই মিঃ নির্মল চোধুরীকে আপনারা হুট্ করে পরোয়ানা জারী করে হাজতে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছেন, কিন্তু আইন শুধু এক তরফাই নয় তাছাড়া মিঃ নির্মল চৌধুরী প্রচুর অর্থ সম্পন্ন লোক—মামলার এ দিক গুলো একবার ও ভেবে দেখলেন না: এটাই আশ্চর্য লেগেছে আমার কাছে!

'আপনার মত তা'হলে অন্যায় ভাবে নির্মলবাবুকে গ্রেপ্তার করান হয়েছে?—'

'গ্রেপ্তার সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই! আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে চার্জ অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আপনারা এনেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। absurd!'

'কিন্তু এসব কথা সেদিন আপনি মিঃ চাকলাদার সাহেবকে বলেন নি কেন?—'

'না মশাই! পরের ব্যাপারে uncalled for মাথা যাবো। আমার স্বভাব বিরুদ্ধ! তাছাড়া আপনাদের চাকলাদারই দেখা ও হয়ত সেটা পছন্দও করতেন না।—' ায় তাঁর

'তবে নির্মলবাবুই যদি সন্তোষ চৌধুরীকে না খুন করে থাকেন তাহলে খুনী কে ? '

'খুন যখন হয়েছে তখন খুনীও আছেন বৈকি একজন ! তাকে খুঁজে বের করতে হবে !

'না মশাই ! ওর নাম কি এ যে কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে ।—

'তা একটুত গুলিয়ে যাবেই ! আসল ব্যাপারটাই যে বিশেষ গোলমেলে ।'

* * * *

শেষ পর্যন্ত কিরীটিকে একাকী নির্জনে নির্মল চৌধুরীর সংগে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হলো ।

শ্যামবাবু সেলের দরজা পর্যন্ত কিরীটিকে পৌছে দিয়ে চলে গেলেন !

একটা মাঝারী আকারের স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে নির্মল চৌধুরী পায়চারী করছিল। কিরীটিকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে চোখ তুলে তাকাল : কে ?

'নমস্কার নির্মলবাবু ! আমি কিরীটি রায়—'

সত্যি ! এই আট দশ দিনেই নির্মল চৌধুরীর যেন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে ।

মুখ ভর্তি দাড়ি রুক্ষ চুল বিস্রস্ত ।

চোখের দৃষ্টিতে একটা অসহায় ক্লান্তির বেদনা ।

ঘরের মধ্যে একটি কাঠের তক্তোপোষের 'পরে সাধারণ শয্যা বিছান ও বসবার জন্য একটি সাধারণ চেয়ার ।

নিজে খাটের 'পরে বসে নির্মল চৌধুরীকে মৃদু সম্বোধন করে কিরীটি : বসুন মিঃ চৌধুরী ! আপনার সংগে আমার কয়েকটা কথা আছে।

চেয়ারটার 'পরে বসতে বসতে নির্মল চৌধুরী বলে : আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায় আমি আমার বাবাকে খুন করিনি ! আমি—

বাধা দিল কিরীটি ; আমি জানি। আপনি খুন করেননি—'

'আপনি : আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন ?—'

'করি !—

'তবে এই কলংক থেকে আমাকে মুক্তি দিন ?—'

'মুক্তি দেওয়ার, আমি কেউ নই মিঃ চৌধুরী ।—'

'তবে—তবে আপনি এখানে এসেছেন কেন ? মজা দেখতে ? যান—যান এখুনি এঘর থেকে চলে যান—'

শুনুন মিঃ চৌধুরী। ছেলে মানুষী করবেন না। আপাততঃ মুক্তি আপনাকে আমি এখান থেকে না দিতে পারলেও খুব শীঘ্র যাতে মুক্তি পান সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি যদি—'

'যদি ! যদি ! কি বলুন ?—'

'যদি আপনি আমার সব কথার সত্য জবাব দেন, কিছু না গোপন করে সব খুলে বলেন ! কেমন রাজী আছেনত ?—'

এবারে নির্মল চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

'নির্মলবাবু ! অবুঝ হবেন না ! যে অভিযোগে আপনি গ্রেপ্তার হয়েছেন সে বড় সাংঘাতিক ! সহজে এ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না—যদি না এখনও সব কথা খুলে বলেন !—'

সহসা যেন নির্মল ভেংগে পড়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে : না ! না—আমি কিছু জানিনা ! আমি কিছু জানি না !

'মিছে কথা ! আপনি জানেন অনেক কিছুই' ! দৃঢ় স্বরে কিরীটি বলে ওঠে।

না ! না না ! আর্তস্বরে নির্মল বলে ওঠে।'

কিরীটি মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে, তারপর বলেঃ বেশ ! তবে আপনি আমার তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন ! পূর্বে যে তিনটি মিথ্যা কথা আমার কাছে বলেছেন !'

'মিথ্যা কথা বলেছি ? ' সবিস্ময়ে তাকায় কিরীটির মুখের দিকে নির্মল চৌধুরী।

'হাঁ ! মিথ্যা কথা !'

'কি ? কি মিথ্যা কথা বলেছি ?'

'১নং যে রাত্রে আপনার বাবা সন্তোষ চৌধুরী মশাই নিহত হন সে রাত্রে আপনি মধুপুরেই ছিলেন, খুনের পরের দিন আপনি আসেন নি ?'

'য়্যা—!'

'হাঁ ! বলুন আমার কথা সত্য কিনা ? 'তার' ইত্যাদি পাওয়ার কথা ; রাণাঘাটে যাওয়া সব আপনার বানান ! আপনি কাউকে Shield করবার চেষ্টা করছেন। বলুন সে কে ?'

'পারবো' না ! পারবো না আমি সে কথা বলতে—তবে হাঁ আপনার কথাই ঠিক ! সে রাত্রে আমি মধুপুরেই ছিলাম !' শেষ কথাটা বলে নির্মলবাবু হাঁপাতে থাকে।

'বেশ তাঁর কথা না বলেন—বলুন মধুপুরে পৌছবার পর ও পরের দিন শেষ রাত্রে নাটকীয় ভাবে আপনার গৃহ প্রবেশের মধ্যে যে দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা সময়—ঐ সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন ?—'

'আমি ষ্টেশনে ছিলাম—'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না ! '

'বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে ছিলাম !

'বেশ না হয় আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম—কিন্তু বাড়ীতে না গিয়ে ওয়েটিং রুমে ২৪ ঘণ্টা ছিলেন কেন ? তবে কি আপনি জানতেন ঐ রাত্রেই আপনার বাবা নিহত হবেন এবং হত্যাকারীকে সেই সুযোগটাই দিয়েছিলেন ?—'

আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে নির্মল চৌধুরী ঃ না ! না। হত্যার ব্যাপারের কথা আমি পর দিন সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত কিছুই জানতাম না ! কিছুই জানতাম না !

'জানতেন না ?—'

'না ! আপনি বিশ্বাস করুন বিন্দু বিসর্গ ও আমি জানতাম না।'

'যদি জানতেনই না—তবে ওয়েটিং রুমে ও ভাবে আপনার চব্বিশ ঘণ্টা আত্মগোপন করে থাকবার কারণ কি ? '

এবারে নির্মল চৌধুরী চুপ করে থাকে।

কিরীটি অবার প্রশ্ন করে : বলুন ! চুপ করে থাকবেন না। আপনি কি বুঝতে পারছেন না কত বড় বিপদের খাড়া আপনার মাথার 'পরে ঝুলছে ?

'আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ! অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে সে আমাকে ঐখানে দেখা করতে বলেছিল :—'

'চিঠি লিখে নিশ্চয়ই দেখা করতে বলেছিল ?—'

'হাঁ—'

'সে চিঠিটা ?—'

'আমি পুড়িয়ে ফেলেছি :—'

'পুড়িয়ে ফেলেছেন ?—'

'হাঁ !—'

'চিঠির মধ্যে ঠিক কি লেখা ছিল সে কথাগুলো অন্তত বলুন ?'

'তাও আপনাকে আমি বলতে পারবো না, সে আমার একান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার !

'বেশ ! কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন জানলেন আপনার বাবা নিহত হয়েছেন তখুনি বাড়ীতে গেলেন না কেন ? অত রাত করে গেলেন কেন ?

'ভয়ে সব কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তাই যাইনি !'

'ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন মিঃ চৌধুরী ! সোজা কথা আপনি তাও বললেন না। আচ্ছা আর একটা কথা সে রাতে যে আমার কাছে আপনার বাবার স্বাক্ষরিত লেখা চিঠিখানা আপনাকে দেখিয়েছিলাম—সেই চিঠির সে হাতের লেখাটা আপনি চেনেন না বলেছিলেন মনে পড়ে ?'

'পড়ে !—'

'আপনি তাহলে সেদিন আমার কাছে সত্য গোপন করেছিলেন বলুন ?

না করিনি কেবলমাত্র মনে মনে একটা অনুমান করেছিলাম কিন্তু কেবল সামান্য একটা অনুমানের 'পরে নির্ভর করে একটা স্বীকারোক্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই সে কথা আপনাকে আমি সেদিন বলিনি।'

'আজও কি আপনি সেই যুক্তিতেই চুপ করে থাকতে চান ?—'

' না ! আজ বলতে বাধা নেই ! সে চিঠির হাতের লেখাটা' —নির্মল চৌধুরী ইতস্ততঃ করতে থাকে !

'বলুন ! চুপ করে রইলেন কেন ?—'

'সে—সে লেখাটা আমার মার হাতের লেখা বলে মনে হয়েছিল !—'

কিরীটি যেন ভীষণ ভাবে চমকে উঠে : সে কি ! তবে ! কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে সামলে নেয় ! তারপর অল্পক্ষণ চুপ করে সে কি যেন ভাবে মনে মনে ভাবে এবং বলে, 'শুনুন মিঃ

চৌধুরী! আমার সংগে না পরামর্শ করে আপনি কাউকে কিছু স্বীকারোক্তি দেবেন না এই কথা আপনার আমাকে দিতে হবে ; কেমন রাজী আছেন আমার প্রস্তাবে ?—'

'বেশ! তাই হবে! কিন্তু—'

'আপনার জামিনের চেষ্টা আমি করছি। আশা করি শীঘ্রই আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারবো। আজকের মত তা'হলে উঠি! নমস্কার!'

কিরীটি বিদায় নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

এরপর নির্মল চৌধুরী একাকী অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। এলোমেলো কত যে চিন্তা একটার পর একটা মনের মধ্যে এসে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে পরস্পর বিরোধী তার অন্ত নেই।

—নয়—

—শ্রীসুবিমল শীল—

পরের দিন বেলা দশটা হবে।

কিরীটি আবার নির্মল চৌধুরীর সংগে দেখা করতে এলো।

'মিঃ রায়! ' সবিস্ময়ে নির্মল চৌধুরী কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

'বিশেষ একটা ব্যাপারে আপনার কাছে আজ আবার আসতে হলো নির্মলবাবু! তবে, এবারে আমি বার্তাবহ মাত্র!' মৃদু হেসে কিরীটি বলে।

'বার্তাবহ?—' নির্মল চৌধুরী যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি এমনি ভাবে কিরীটির মুখের দিকে তাকাল।

'হাঁ! কবি মৃণালিনী—' কিরীটি মৃদুকণ্ঠে বলে।

'মীনু! কোথায়? কোথায় সে?—'

'আজই ভোর রাত্রের ট্রেনে তিনি মধুপুরে এসেছেন। ষ্টেশনেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে তার সংগে আমার কথা হয়েছে!—'

'কথা হয়েছে? কি কথা হলো?—' একান্ত উদ্‌গ্রীব ভাবে নির্মল চৌধুরী প্রশ্ন করে।

ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনার কাছে বলতে আমার ইচ্ছা নেই তবে মৃণালিনী দেবী আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন, বিশেষ করে সেই চিঠিটাই আপনার হাতে নিরাপদে পৌঁছে দিতেই আমার এসময়ে এখানে আসা।' কিরীটি কোন মতে বক্তব্যটা যেন শেষ করে।

'চিঠি! মীনু চিঠি দিয়েছে?—কই! কই সে চিঠি?—'

'এই নিন!—' কিরীটি জামার ভিতরের পকেট থেকে একখানা সবুজ রংয়ের খামে আঁটা চিঠি বের করে নির্মলবাবুর হাতে দিল, কতকটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই।

বিশেষ উদগ্রীব হ'য়ে নির্মলবাবু খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা খুলে ফেলেন, উত্তেজনায় হাত দুটি যেন তার কাঁপছে! অধীর আগ্রহে তখুনি সে চিঠিটায় মনঃসংযোগ করে।

চিঠিটা খুব ছোটও নয় এবং দীর্ঘও নয়।

কিরীটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নির্মলের মুখের দিকে।

চোখে মুখে তার তীব্র ব্যাকুলতা! সহসা নির্মলবাবু চিঠি পড়েই একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে ওঠে—মীনুর বাবা খুন হয়েছেন!—' সংগে সংগে আরো আগ্রহ নিয়ে সে চিঠিখানা পড়ায় মন দেয়।

উত্তেজনা ও আগ্রহের মধ্যে কোন কিছু ভাল করে চিন্তা করে বা বুঝে দেখবার শক্তিও যেন তাঁর নেই!

নচেৎ একটু স্থিরভাবে চিন্তা করে দেখলেই সে বুঝতে

পারতো হাতের লেখাটা ঠিক মৃণালিনী দেবীর হস্তাক্ষরের মত হলেও সত্যি করে মোটেই তার হস্তাক্ষর নয়।

চিঠিটা সম্পূর্ণ বানান ও তৈরী করা। একেবারে অন্য হাতের লেখা!

কিন্তু কিরীটির কাজ হয়ে গেছে—যে ব্যাপারটা সে জানতে চাইছিল নির্মলের কাছ থেকে, তাকে এই চিঠির প্যাঁচে ফেলে সবটাই তার প্রায় জানা হয়ে গিয়েছে, এখন বাকীটা—ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নির্মলের মুখের দিকে।

নির্মল চিঠিটা পড়ছিল :

নির্মল—

স্বেচ্ছায় তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি! কারণ অকস্মাৎ যে ঝড়ের ঝাপ্‌টা আমার মাথার 'পরে এসে পড়েছে, আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। গত সোমবার আমার বাবা 'কালোপাঞ্জা'র হাতে নিহত হয়েছেন। আমার আশংকা যে এত দ্রুত কঠিন সত্যে পরিণত হবে, বাবার মৃতদেহ দেখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বপ্নেও তা ভাবিনি। বাবাকে ও তোমার বাবার মত অনুরূপ হাতীর দাঁতের বাটওয়ালা একটি ছোরা দিয়ে খুন করা হয়েছে! তারপর—তারপর শুনলাম তুমিও হাজতে এবং পিতৃহত্যার অভিযোগ তোমার মাথার 'পরে। আমি হঠাৎ কেন মধুপুর ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছিলাম তুমিত' জান! শংকর নারায়ণের হত্যা এবং মাঠের মধ্যে তোমার ও আমার শেষ সাক্ষাৎ

তারপর হতেই ঘটনার গতি এত দ্রুত এগিয়ে চলেছে যে—সে রাত্রে তোমার সংগে আমার ষ্টেশনের বাইরে সাক্ষাৎ—

চিঠিখানা অত্যন্ত দ্রুত ও আগ্রহ সহকারে এই পর্যন্ত পড়েই নির্মল চিঠি থেকে মুখ তুলে প্রথমে কিরীটির মুখের দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানা পরীক্ষা করতে করতে বললে : একি !—'

'কি হলো ?—' কিরীটি যেন কিছুই জানে না এইভাবে প্রশ্ন করে, অনেকটা বোকা বোকা ভাব করে।

'এত' মিনুর চিঠি নয় ?—' সন্দিগ্ধ ভাবে নির্মল চৌধুরী বলে।

'মিনুর চিঠি নয় ! কি বলছেন আপনি ?—'

'ঠিকই বলছি মিঃ রায়, এটা আদপেই মীনুর লেখা চিঠি নয়। প্রথম দিকটায় উত্তেজনার মধ্যে আমি অতটা বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, না—এ মীনুর হাতের লেখা নয় ! বলুন এর মানে কি ?'

কিরীটিই এবারে হেসে ফেলে : আমার এ চালাকী টুকু মাপ করবেন নির্মলবাবু ! একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে এ পন্থা নিতে হয়েছে। এছাড়া আর আমার সহজ কোন দ্বিতীয় পথই ছিলনা ! আমি ভেবেছিলাম চিঠির গোড়াতেই আপনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারবেন ।—'

'কিন্তু—একথা কি সত্যি মীনুর বাবাও 'কালোপাঞ্জা'র হাতে নিহত হয়েছেন ?

'হাঁ! এবং চিঠিতে ঐ সত্যটুকু ছিল বলেই আপনাকে এত সহজে আমি ধোঁকা দিতে পেরেছি।'

তারপর একটু থেমে আবার বলতে সুরু করে।

'তাছাড়া আরো দুটো কথা আপনার কাছ হ'তে জানবার ছিল—১নং সে রাত্রে সন্ধ্যার পর বা রাত্রে আপনার মাধবী ভিলায় উপস্থিত হবার পূর্বে কোথায়ও আপনার মৃণালিনী দেবীর সংগে মাঠের মধ্যে দেখা হয়েছিল কিনা? এখন বুঝতে পারছি হয়েছিল!—'

'কিন্তু তা জেনে আপনার কি লাভ?—' প্রশ্ন করে নির্মল চৌধুরী!

'এই লাভ যে আমার জানা দরকার মৃণালিনী দেবীর মুখেই আপনি আপনার পিতার হত্যার সংবাদ পেয়েছিলেন, না অন্য কারো কাছে পেয়েছিলেন?—'

'হাঁ মীনুর কাছেই সংবাদটা আমি প্রথমে পেয়েছিলাম! সেই আমাকে মাঠের মধ্যে বলে—আপনার সংগে সেই সন্ধ্যায় মীনু কথাবার্তা বলবার পর হঠাৎ শংকর নারায়ণের মৃতদেহ দেখে যখন আপনি মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত সেই ফাঁকে সে সরে পড়ে এবং পালাবার সময় মাঠের মধ্যে আমার সংগে তার অতর্কিতে দেখা হয়। তার মুখেই আমি আমার পিতার হত্যা সংবাদ ও আপনার এখানে আসবার কথা জানতে পারি! '

'যাক্! অনুমানের 'পরে নির্ভর করে অন্ধকারে যে তীরটা ছুঁড়েছিলাম এখন দেখছি অন্ধকারেও সেটা লক্ষ্যভেদ ঠিক

করেছে ; কিন্তু এও বুঝতে পারছি দ্বিতীয় অনুমানটি নাটকের
ভুল হয়েছে। লছে

ষ্টেশনে আপনি অপেক্ষা করছিলেন মৃণালিনী দেবীর জন্য নয়।—'

'না!—'

'এখনো আপনার সেই কথা বলতে আপত্তি নির্মলবাবু?—'

'হাঁ!—'

'যাক্ গে! আপনি বলবেনই না যখন বৃথা পীড়াপীড়ি করে আর লাভ নেই। জানতে আমি একদিন পারবোই আপনি না বললেও, তবে সময় নেবে হয়ত। আপনি বলে দিলে সহজে ব্যাপারটা মিটে যেত এই আর কি!' কিরীটি দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে কথাগুলো বলে।

নির্মল চৌধুরী তবু চুপ করেই থাকে।

* * *

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে কিরীটি সুব্রতকে একটা জরুরী চিঠি লিখছিল।

সুব্রত!

এখানকার কাজ আমার প্রায় শেষ হয়ে এলো। তিন চার দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরছি। 'কালোপাঞ্জা'র কালো রহস্য একপ্রকার মীমাংসা করে এনেছি। সূত্রগুলো এত বিশ্রীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল একটা থেকে আর একটা যে, প্রথমটায় সত্যিই আমাকে বিশেষ গোলমালে ফেলেছিল।

'হাঁ!' ধরতে গিয়ে আর একটার যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। এত সে রাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে মৃণালিনী দেবীর মুখ হতে যে কথাটা শুনেছিলাম, আসলে কথাটা সত্যিই তাই। একটা উন্মাদ প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই পর পর এই তিনটি নৃশংস হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের শুভ বুদ্ধি যখন নিঃশেষে তাঁর অন্তর থেকে নির্বাসিত হয়, কল্যাণ ও মংগলের পথ এমনি ভাবেই বোধ হয় রুদ্ধ হ'য়ে যায়। তার সহজ ও সরল দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

মদ খেয়ে মানুষ নেশা করে এবং মদের নেশার এমনি একটা মজা যে উত্তরোত্তর মদের পরিমাণটাকে না বাড়ালে নেশার পরিমাণও যায় কমে : তাই হয়ত পরবর্তী কালে মদই নেশাকে অতিক্রম করে গিয়ে গোটা মানুষটাকেই গিলে ফেলে। crime বা অপরাধ বৃত্তিটাও মানুষের অনেক সময় ছু' এক বারের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেশায় পরিণত হয় শেষটায় এবং ক্রমে তার অন্তরের সমস্ত শুভ ও কল্যাণ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অনিবার্য ধ্বংসের পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় কতকটা তার অজ্ঞাতেই। পরে অবিশ্যি সে জালকে অতিক্রম করবারও তার ক্ষমতা থাকে না! 'কালোপাঞ্জা'র জীবনীকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলেও ঠিক তাই দেখা যায়।

অবিশ্যি যতটুকু তাঁর সম্পর্কে আমরা জানবার অবকাশ পেয়েছি তা থেকে।

তবু একটা কথা না স্বীকার করে আমি এখানে পারছিনা

অন্তরের ভয়ংকর প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করবার নাটকের নির্মম আত্মঘাতী রাস্তা সে বেছে নিয়েছে শেষ বদলেছে যতই চাতুরী খেলুক না কেন, নিজেকে সে অ। ধ্বংসের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তার পরিকল্পনা বা কর্মের পরাজয় সেইখানেই : যা আজও পর্যন্ত সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাকে আমি প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই উদ্ঘাটন করেছি, কেবল মাত্র একটি সামান্য মীমাংসা ছাড়া। বলতে পারিনা হয়ত এমনও হতে পারে ঐ সামান্য মীমাংসার সূত্রকে কেন্দ্র করে আমার সমস্ত পরিশ্রম বা মীমাংসা একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত পথেও বইতে পারে। এবং এতবড় মারাত্মক ভুলও যদি করে থাকি তবু আমার দুঃখ থাকবে না তখন, যখন সমগ্র রহস্যটির উপর হতে অন্ধকারের যবনিকা উঠে যাবে এবং আসল ও সত্যিকারের রূপটি প্রকাশিত হবে।

নির্মল চৌধুরী মৃণালিনীকে ভালবাসেন।

সামান্য অনুমানের 'পরে নির্ভর করে যে বস্তুটা বিচার করতে গিয়েছিলাম, আজ দেখছি সেটা শুধু মাত্র অনুমানই নয় অত্যন্ত কঠোর সত্য।

সামাজিক দিক দিয়ে সুমিত্রার ছেলের সংগে সুচিত্রার মেয়ের এ ধরনের ভালবাসাটা স্বীকৃত হবে কিনা সে প্রশ্ন সমাজকারীদের, সত্যান্বেষী আমার নয়।

আমি বুঝেছি তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে

হাঁ ! ধর ...র ভয়েই হয়ত তারা আজও চুপ করেই এত...

সে ... কিন্তু সমাজের দাবী দিয়ে অন্তরের দাবীকে কতদিন ...র ঠেকিয়ে রাখা যাবে সেইটাই এক্ষেত্রে বিচার্য !

আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা যখনই ভাবি তখুনি মনে মনে হাসি পায় : বিধাতার খেলবার ধারাটাও কি নির্মম ! দুটি ভিন্নমুখী রক্ত প্রবাহ কেমন করে আবার পাশাপাশি এসে পড়েছে অবশ্যম্ভাবী মিলনের অচ্ছেদ্য এবং অনিবার্য আকর্ষণে। এবং এই মিলন যদি সম্ভব হয় কোনদিন' জানবি দুস্তর এক দুঃখ সমুদ্র পার হয়ে শান্তির দ্বীপে তরী ভিড়লো। মৃণালিনী দেবীর 'পরে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কারণ তার এই চরম সংকটে আশেপাশে সত্যিকারের বন্ধু কেউই নেই। যারা হয়ত আছেন তারাও মুখোসধারী মাত্র !

বেচারী, যে জাল থেকে সে একজনকে ছাড়াতে এতদূর ছুটে এসেছিল, আজ নিজেই সেই জালে আটকা পড়েছে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর খেলা !

মৃণালিনীর সংগে এবারে যা কথা বলবার তা আমিই বলবো প্রয়োজন হলে।

তুই আর তাকে এবিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিস না।

অনিলবাবু ওখানে গিয়েছেন সেও 'একদিক থেকে আশার কথা।

নাটকের পরিসমাপ্তিতে একে একে সকলকেই একজায়গায়

এসে মিলতে হতো এই ছিল আগেকার কালের নাটকের ধারা। এখন অবিশ্যি যুগ বদলেছে, সে সংগে বদলেছে ধারাও।

তবে এ নাটকের শেষ দৃশ্যে কারা কারা থাকবেন, সেই হচ্ছে বিচার্য!

আজকের মত ইতি করছি : ভালবাসা রইলো।

তোর কিরীটি

* * *

পরের দিন প্রত্যুষে ঘুম হতে উঠেই, নীচে সুবিমল শীলের গলা শুনে কিরীটি বুঝতে পারলে শীল মশায়ই আবার ফিরে এসেছেন।

তবে হঠাৎ আবার ফিরে আসবার ঠিক যে কি হেতু তা চট করে বুঝে উঠতে পারে না।

হাতমুখ ধুয়ে নীচে আসতেই বসবার ঘরে সুবিমলের সংগে দেখা হয়ে গেল।

শীল মহাশয়ই প্রথমে সুপ্রভাত ও সম্ভাষণ জানালেন : এই যে মিঃ রায়, জানতে এলাম কতদূর কি করলেন?

কিরীটি মৃদু হেসে জবাব দেয় : বিশেষ কিছুই এখনো অগ্রসর হতে পারিনি, তবে নির্মলবাবুকে বোধ হয় ২।১ দিনের মধ্যেই জামিনে খালাস করে আনতে পারবো বলে মনে হয়!

'সত্যি! তাহলেই ষোল আনার মধ্যে বার আনা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যা হবার তাই হয়ে গেল এখন যাতে সকল

দিক বজায় রেখে একটা মাঝামাঝি পথ বের করা যায় বিশেষ করে সেটাই হয়েছে বর্তমানে প্রয়োজন। কোথা হতে যে কি হয়ে গেল। আমারত' মশাই এঁদের এ কারবারেই আর মন বসছে না। হাংগামাটা মিটে গেলে এবং নির্মলবাবু একটু সুস্থ হলেই এ কার্জ ছেড়ে দেবো। ভাল কথা চাকর বাকরেরাত' বিশেষ কিছু বলতে পারলে না, মিসেস্ চৌধুরী কেমন আছেন জানেন কিছু ?—'

'এ কয়দিন তাঁর সংগেত' বিশেষ তেমন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, তবে অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন—

'আহা! তা পড়বেনইত'! এই বয়সে স্বামীর মৃত্যু, তা ছাড়া এমনি অপঘাতে মৃত্যু!

তা উনি এখানে পড়ে আছেন কেন? আমারত, মনে হয় এ বাড়ী থেকে কিছুদিন এখন তাঁর দূরে থাকলেই সব দিক দিয়ে ভাল হতো। এখানকার চারিদিককার সব স্মৃতি মনের 'পরে এওত' কম ক্ষতি করে না।

'আপনি একবার বলে দেখুন না ?—'

'আমি!—' মৃদু হাসেন সুবিমল শীল: আমি তাঁদের একজন সামান্য বেতনভুক ভৃত্য বইতো নয়! আমার সংগে যে সামান্য কথাবার্তা বলেন সেটাই একটা অনুগ্রহ।

আমার পক্ষে ওটা অনধিকার চর্চাই হবে মিঃ রায়!—'

'নির্মলবাবুর একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা না হওয়

পর্যন্ত যে উনি এখান থেকে নড়বেন তা আমার মনে হয় না মিঃ শীল !'

'তাও বটে ! ওইত' একটি মাত্র ছেলে' ! তারপর হঠাৎ একসময় শীল প্রশ্ন করেন : আচ্ছা মিঃ রায়, আপনার কি মনে হয় ? সত্যিই কি নির্মলবাবু এ ব্যাপারে দোষী ?—'

'দেখুন দোষী ঠিক যে নন সেও যেমন সত্যি, একেবারে নির্দোষী নন এও সত্যি !—'

'মানে কি আপনি বলতে চান মিঃ রায় ?—'

'হংসরাজ যে ঠিক কি প্রমাণের 'পরে নির্ভর করে নির্মলবাবুকে গ্রেপ্তার করেছেন তা জানিনা, তবে গ্রেপ্তার যখন করেছেন এবং এতবড় একটা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে খাড়া করে তখন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর প্রমাণ তার হাতে আছেই !—'

'কিন্তু কি করেই বা এ সম্ভব ! হত্যার সময় আগে বা তিনিত' মধুপুরেই ছিলেন না !'

'হত্যার সময়টিতে ঠিক না থাকলেও আগে বা পরে যে তিনি মধুপুরে ছিলেন না, তা আপনি কি করে জানলেন ?'

'এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায় ! তিনিত' তার পোর কলকাতা থেকে আসেন ।'

থাকে তা জানলেও আসল ব্যাপারটা হয়ত তা ঠিক নয় !'—

'এ কিরকম কথা বলছেন আপনি মিঃ রায় ?'

'ঠিকই বলেছি এবং আপনি! হ্যাঁ আপনিও সেটা বেশ ভাল ভাবেই জানেন নাকি মিঃ শীল?'

'আমি!—'

'হাঁ আপনি শ্রীযুক্ত সুবিমল শীল!' বলতে বলতে হঠাৎ জামার বুক পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে সুবিমল শীলের চোখের সামনে মেলে তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলে: দেখুন! দেখুনত' এই তারটা genuine কিনা?—'

কিরীটির প্রশ্নে মুহূর্তের জন্য যেন সুবিমল শীল কিরকম হতভম্ব হয়ে যান। একটি শব্দও তার মুখ ফুটে বের হয় না।

'এই 'তার' পেয়েই নাকি নির্মলবাবু এখানে আসেন। অথচ দেখুন ভাল করে' তার'টা পরীক্ষা করে, এ তার যেদিন এখান থেকে করা হয়েছে বলে নির্মলবাবু বলেছেন, ডাক ঘরের ষ্ট্যাম্পটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না, এটা যেদিন সন্তোষ চৌধুরী মারা যান রাতে সেদিনকার সকালের তারিখ এতে আছে। তার মানে হ পূর্বেই নির্মলবাবুকে তার করা হয়েছিল যে father exp come sharp! এ থেকে দুটি কথা ভাবতে পারি তাঁদের প্রথমতঃ everything pre-arranged অর্থাৎ স আমার আগে থাকতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল—দ্বিতীয়তঃ একটা না হয়ে থাকে শ্যামবাবু নির্মলবাবুকে তাঁর পিতার মৃত্যু দিয়ে যে 'তার' করেছিলেন, এটা মোটেই সেই আসল নয়, এটা একটা নকল 'তার' মাত্র! আপনি জানতেন হওয়া

নির্মলবাবু দিন দুই আগেই কলকাতা ছেড়ে চলে যান এবং 'তারটা' যখন অফিসে পৌঁছায় তখন তিনি অফিসে অনুপস্থিত অর্থাৎ 'তার' পাননি। হত্যার দিন সকাল থেকেই নির্মলবাবু মধুপুরে ছিলেন। আপনি এখানে এসে যখন সব কথা জানতে পারলেন, তখন কেন আমাদের বলেননি আসল ও সত্য কথাটি ?—

'আমি !—আমি !'

'বলবেন আপনি এর কিছু জানেন না ! কিন্তু পুলিশের লোক সে কথাত' বিশ্বাস করতে চাইবে না মিঃ শীল ! তারা বলতে বাধ্য হবে যে কোন কারণ বশতঃ নিশ্চয়ই আপনি আসল কথা গোপন করেছেন !—'

'হাঁ করেছিলাম—সেও নির্মলবাবুকে বাঁচাতেই ! যখন এসে সব শুনলাম, তখনই বুঝেছিলাম আসল কথাটি বললে তাঁর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা !— '

'শুধু কি একমাত্র সেই কারণেই আপনি আসল কথাটি গোপন করছিলেন মিঃ শীল ?—'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবিমল শীল কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটির চোখের তারায়ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি !

চার জোড়া ছুরির ফলা যেন ঝিঁকিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা নেমে এসেছে। দেওয়ালে ঝুলন্ত ঘড়ির দোদুল্যমান পেণ্ডুলামটা একটানা শব্দ করে যাচ্ছে টক্ টক্ টক্ করে।

বাইরে কোথায় একটা পাখী ডেকে ওঠে !

'যদি বলি মিঃ রায় কেবল মাত্র সেই জন্যই আমি সেদিন সত্য গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলাম ? আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না ?—'

'একথার জবাব আপনার আর একদিন খুব শীঘ্রই দেবো মিঃ শীল। আজ নয়।'

'বেশ !—'

কিরীটি ধীর শান্ত পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

—দশ—

—প্রতিশ্রুতি—

আরো দিন দুই বাদে কিরীটি দশ হাজার টাকার জামিনে নির্মল চৌধুরীকে খালাস করে নিয়ে এল। এ কয় দিনের হাজত বাসেই নির্মল চৌধুরীর চোখে মুখে যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট কালো ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে।

নির্মল বাড়ীতে এসে প্রথমেই সোজা তার মার শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হলো।

খোলা জানালার ধারে একটা আরাম কেদারার 'পরে মিসেস্ চৌধুরী অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন। চোখের দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ।

নির্মল এসে ঘরে প্রবেশ করে—'মা' বলে ডাকতেই মিসেস্ চৌধুরী চম্‌কে উঠে বসেন : কে ?

'মা ! আমি নিমু !—'

'নিমু ! এলি বাবা !—'

মিসেস চৌধুরী ব্যগ্র দু'টি বাহুর আলিংগনে পুত্রকে বক্ষের মধ্যে চেপে ধরেন। দু'চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রু অবিরল ধারায় নেমে আসে।

'কিরীটিবাবু না থাকলে—জামিনেও খালাস পেতাম না মা! সত্যিই তিনি আমাদের হিতৈষী!—'

মিসেস চৌধুরী পুত্রের কথায় কোনই জবাব দেন না।

'কিরীটিবাবু আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতা চলে যাচ্ছেন মা!—'

'সেকি! কে বললে?—'

'হাঁ—থানা থেকে আসতে আসতে আমাকে বলছিলেন!'

'আমি যাই!—'

'কোথায়?'

'যাই একবার কিরীটিবাবুর সংগে দেখা করে আসি!—'

'আমরাও আজই কলকাতায় যাবো মা!—'

'কলকাতায় যাবো, আজই?—'

'হাঁ!—এখানে আর থাকতে পারছি না!'

'আচ্ছা সে হবেখন!—'

মিসেস চৌধুরী ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন।

* * *

কিরীটি সুটকেসটার মধ্যে জামা-কাপড়গুলো ভরছিল।

মিসেস্ চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন: কিরীটিবাবু?

'কে? ও মিসেস্ চৌধুরী!—'বস্থন'—!—'

'ও নামে আর আমাকে ডাকবেন না কিরীটিবাবু আপনিত' আমার নাম জানেন, সুমিত্রা!—'

'বেশ—'

'নিমুর মুখে শুনলাম আপনি নাকি আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ ! এখানকার কাজত' আমার শেষ হয়েছে সুমিত্রা দেবী !—'

'কিন্তু আপনি যে জন্য এখানে এসেছিলেন সে কাজত' এখনও আপনার শেষ হয়নি কিরীটিবাবু ?—'

'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন সুমিত্রা দেবী—বসুন ?—'

খালি চেয়ারটা অধিকার করে সুমিত্রা উপবেশন করলেন।

'না, সে কাজ অবিশ্যি এখনও আমার সম্পূর্ণ হয়নি এবং আমি যখন স্বেচ্ছায় সে কর্তব্য মাথায় তুলে নিয়েছি, সব কিছু একটা শেষ মীমাংসা করবোই !—'

'তবে—তবে ! আপনি চলে যাচ্ছেন কেন ? আমাদের দিক থেকে কি কোন ত্রুটি হয়েছে, কিরীটিবাবু ? আপনিত' জানেন কি রকম মানসিক অবস্থার মধ্যদিয়ে দিন আমার যাচ্ছে ?—'

'না ! না—সে রকম কোন কিছুই নয়। শুনুন সুমিত্রা দেবী ! আপনি যখন নিজে থেকেই বিষয়টা উত্থাপন করেছেন, খোলাখুলিই সব আপনাকে বলবো ! আপনার স্বামীর হত্যা রহস্যের সংগে আপনার অতীত জীবনের এমন অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, যার জট না খুললে বর্তমানে কোন সত্যিকারের মীমাংসাতেই পৌছান অসম্ভব। অথচ তাতে হয়ত আপনার লাভের চাইতে ক্ষতির পরিমাণটাই হবে বেশী ! তার চাইতে আমি ভেবেছিলাম আপনাকে অনুরোধ

জানাবো, এব্যাপার থেকে আমাকে এখন থেকেই ছুটি দিতে। পুলিশের লোকেরা যতদূর পারে করুক! আর আপনার ছেলের কথা—তার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণই পুলিশের জানা নেই, যাতে করে তাকে এ হত্যা ব্যাপারে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। এবং তাদের সে ক্ষমতাও নেই জানবেন!—'

'না!—'

সহসা সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে যেন কিরীটি চমকে ওঠে।

মিসেস্ চৌধুরীর ঠিক এই ধরণের কণ্ঠস্বর কিরীটি এখানে আসা অবধি শোনেনি।

কণ্ঠস্বরে একটা অবিসংবাদী দৃঢ়তা ও অনন্যতা যেন ফুটে উঠেছে।

সুমিত্রা বললেন: না! তা' হবেনা কিরীটিবাবু! এ কয়দিন অর্থাৎ আপনাকে আমার ডাইরীটা পড়তে দেবার 'পর থেকেই, কেবল ঐ কথাটাই অহোরাত্র চিন্তা করেছি এবং স্থির করেছি—এর একটা সত্যিকারের মীমাংসায় আমাকে পৌঁছাতেই হবে। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর সংগে আমি যে ব্যবহারই করে থাকি না কেন—আজ তাঁর নৃশংস হত্যার পরও যদি আমি চুপ করেই থাকি, তাহলে আমার মধ্যে যে নারীত্ব আছে, তাকেই করা হবে অপমানিত-লাঞ্ছিত! আমার কৃত কর্মের ফল আমাকেই বহন করতে দিন। যদি কোন পাপ করে থাকি প্রায়শ্চিত্তও তার করতে দিন। এমন কি তার জন্য আজ যদি আমার শেষ ও জীবনের একমাত্র

বন্ধন নির্মুক্তেও হারাতে হয়, তাতে—তাতেও আমি প্রস্তুত জানবেন।—'

'সুমিত্রা দেবী?—'

'হাঁ কিরীটিবাবু! এই আমার শেষ কথা! আজ দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, যে লাঞ্ছনা আত্ম-অপমান সহ্য করেছি তারপরও কি আপনি মনে করেন বাইশ বছর আগেকার সে সুমিত্রা আজও বেঁচে আছে? না! সে মরে পাথর হয়ে গেছে। তার মন শিলীভূত হয়ে গেছে। আমি পারবো! সব সহ্য করতে পারবো। বলতে বলতে সুমিত্রা দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

বংশ পত্রের মত সমস্ত শরীর তার কাঁপছে।

কিরীটির মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা ঝড়ের আঘাতে সতেজ একটি গাছ যেন ভেংগে দুমড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে একেবারে।

করুণায় বেদনায় কিরীটির সমস্ত মন যেন সহসা কেমন দ্রব হয়ে আসে।

সামান্য এক নারী হয়ে সুমিত্রা যা সহ্য করেছে, অন্যের পক্ষে হয়ত তা সহ্য করা ধারণার অতীত ছিল।

'সুমিত্রা দেবী?—' সস্নেহে কিরীটি ডাকে।

সুমিত্রা মাথা তুললেন: দু'টি চক্ষের কোলে তখনও অশ্রুর সুস্পষ্ট রেখা। অশ্রু সিক্ত অক্ষি-পল্লব থর থর করে কাঁপছে।

'কেবল মাত্র আপনার কথা ভেবেই আমি শেষ পর্যন্ত ভেবেছিলাম, এ ব্যাপার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবো। কারণ আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে আপনাকেই হয়ত সবার চাইতে বেশী আঘাত সহ্য করতে হবে। তা ছাড়া যা অতীত, গত হয়েছে, মিথ্যে আজ আবার তাকে বর্তমানের আলোয় টেনে এনে, অকারণ দুঃখ ও লজ্জা ডেকে আনবেন কেন? থাক না কেন অতীত-অতীতের অন্ধকারেই ভুলের মাঝখানে।'

'না! কিরীটিবাবু-না! যে লজ্জা ও দুঃখের, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আমিও কতকটা কারণ তা যতই রূঢ় ও কঠিন হোক না কেন, মাথা পেতে আজ তার ফলাফল বা শুভাশুভকে আমার মেনে নিতেই হবে। তা ছাড়া আমার জীবনের শেষ ও একমাত্র বন্ধন —আমার পুত্র! —'

'হাঁ! সেটাও নিশ্চয়ই আপনি ভেবেছেন?—'

'ভেবেছি বৈকি! সে মুখ ফুটে না বললেও আমি কি বুঝতে পারিনি, ইদানিং কয়েক বছর ধরে আমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে তারও মনের মধ্যে একটা রীতিমত দ্বন্দ্ব বেধে ছিল।

এতে হয়ত সে দ্বন্দ্বেরও একটা মীমাংসা হয়ে যাবে!'

'বেশ! তবে তাই হবে সুমিত্রা দেবী! সমস্ত রহস্যেরই আমি মীমাংসা করে দেবো।'

'আরো একটা কথা আছে মিঃ রায়!—'

'বলুন?—'

'জীবিত কালে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও আদান

প্রদান যাই থাকুক না কেন, আজ তাঁর মৃত্যুর পরে এটুকুও যদি না করি তা'হলে আমাকেই ধর্মে পতিত হতে হবে।'

মানুষটাকে তার জীবিতকালে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না দিতে পারলেও—আজ তার মৃত্যুর পর কোন বিদ্বেষই আর নেই! সেই কারণেও স্বামীর হত্যাকারীকে আমার ধরতেই হবে।'

'আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে ধরতে কোনই বেগ পেতে হবেনা যদি আপনি আমার সহায় হন; অকপটে এখনো সব কথা স্বীকার করেন!—'

'আমার কোন কথাইত আর আপনার কাছে গোপন নেই, মিঃ রায়?—'

'আছে বৈকি! এখনো অনেক কিছুই আছে বলতে বাকী!

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?'

'যে রাত্রে আপনার স্বামী নিহত হন সে রাত্রের সমস্ত সত্য ঘটনা কি আজও আপনি আমার কাছে বলেছেন?

মুহূর্তে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরংগাঘাতে সুমিত্রার সমস্ত শরীর স্তব্ধ অসাড় হয়ে গেল।

কিন্তু খুব শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিত্রা বললেন: বলুন কি আপনি জানতে চান?

নিজে থেকে প্রশ্ন করে একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি কিছুই জানতে চাই না সুমিত্রা দেবী, আপনার কাছ থেকে

আমি চাই—সে রাত্রের সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক আপনি অকপটে আমাকে খুলে বলুন !—'

কিরীটির প্রশ্নে সুমিত্রা কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কিরীটির বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয়না : কি নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব সেই মুহূর্তে চলেছে সুমিত্রার সমগ্র মন জুড়ে।

* * * *

বর্তমান মুহূর্তটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত ও দৃঢ় করে নিতে সুমিত্রার কয়েক মুহূর্ত গেল।

আজ সে সত্যিই দৃঢ়সংকল্প !

অহর্নিশি নিরন্তর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, আজ তাকে সত্যিই সহ্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছে। আজ অকপটে নিজেকে সকল প্রশ্নের সামনেই উদঘাটিত করে দাঁড় করান ছাড়া অন্য দ্বিতীয় পন্থাই নেই !

'সত্যি কিরীটিবাবু, সেদিন আমার স্বামীর হত্যার ব্যাপারে পুলিশের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছিলাম, তা সম্পূর্ণ সত্যি নয়।'

'আমি তা জানি সুমিত্রা দেবী !—'

'আপনি জানেন ?—'

'হাঁ—মানে প্রথম হ'তেই আপনার জবানবন্দী শুনে ধারণা হয়েছিল আসল ও সত্য কথা আপনি আমাদের কাছ থেকে গোপন করেছেন।—'

'কেন ?—'

'কেন ? যার মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক বলে সামান্য পদার্থ টুকুও

আছে সেই বলবে আপনি যা বলেছেন তা সত্য ও সম্ভব হ'তে পারে না। আপনি বলেছিলেন—রাত প্রায় ছুটার সময় একটা গোলমালের শব্দে ও মুখের 'পরে একটা অস্বোয়াস্তিকর চাপে আপনার ঘুম ভেংগে যায়; তখন দেখতে পেলেন আপনার হাত পা বাঁধা এবং একজন মুখোসধারী আপনার মুখে কাপড় গুঁজে মুখটা বাঁধছে। কিন্তু আপনার চোখ ছ'টো খোলাই ছিল। এখানেই আমি প্রশ্ন করবো—কেন যাঁরা নিজেদের মুখে মুখোস এঁটে, আপনার হাত-পা, মুখ বেঁধে এতখানি সাবধানতা নিল, তারা আপনার চোখ খোলা রাখলে কেন?—দ্বিতীয়তঃ আপনার স্বামীকে নিয়ে আততায়ীরা ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাবার পর আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যতক্ষণ তারা ঘরের মধ্যে ছিল, আপনার স্বামীর সংগে কথা কাটাকাটি হলো, ততক্ষণ আপনি বেশ রইলেন—যেই তারা ঘর হ'তে বের হয়ে গেল আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আপনি বলুন ব্যাপারটা একেবারে ছেলে ভুলান চেষ্টা নয় কি? তারপর দেখুন পরদিন সকাল বেলা ভৃত্য রাঘবের ডাকা-ডাকিতে আবিষ্কৃত হলো। আপনি তখনও জ্ঞান ফিরে পাননি। ভয় পেয়েই সত্যি যদি আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকতেন, তবু বলবো, এতক্ষণ ধরে কেউ কি অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে? যদি বলি ঘুমিয়েছিলেন—তাও সত্য নয় বাঁধা অবস্থায়, কেই কি ঘুমাতে পারে? আমি বলবো আপনি আগাগোড়াই সম্পূর্ণ জ্ঞানে ছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা আপনি দেখেছেন এবং সকালেও সম্পূর্ণ জ্ঞানেই ছিলেন—অজ্ঞানের ভান মাত্র সেটা।'

মিসেস্ চৌধুরী যেন একেবারে নির্বাক।

একটি শব্দও তাঁর মুখ দিয়ে বের হয় না।

কিছুক্ষণ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন।

তারপর এক সময় ধীরে ধীরে মুখ তুললেন : না সত্যিই আমি জ্ঞান হারাইনি কিরীটিবাবু! সকাল বেলাতেও ইচ্ছা করেই অজ্ঞানের ভান করেছিলাম। চোখ আমার তারা বাঁধেনি বোধ হয় ইচ্ছা করেই। তাদের হয়'ত ইচ্ছা ছিল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটুক। কেবল আমি যাতে বাধা না দিতে পারি ও চীৎকার করে লোকজন না ডাকতে পারি সেই জন্য হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে বেঁধে দিয়েছিল।

'সত্যিই আপনি তাদের কাউকেই চিনতে পারেননি? এমন কি গলার স্বরও না?—'

'না! তাদের মধ্যে যে অরিন্দম ছিল না, সে আপনাকে আমি হলফ্ করে বলতে পারি। তবে এও আমার স্থির বিশ্বাস অরিন্দম সেখানে না থাকলেও তারই ইংগিতে সব কিছু ঘটেছে।—

'কেন? একথা আপনার মনে হয় কেন?—'

'আমার ডাইরী পড়েও কি আপনি সে কথা বুঝতে পারেন নি?—'

'একটা কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন সুমিত্রা দেবী! অরিন্দমকে আপনি যতই নীচ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবুন না

কেন, এত বড় দুর্বলতা সে প্রকাশ করবে না। সে সম্পূর্ণ অন্য ধাতে তৈরী মানুষ !

'আপনি !—'

'হাঁ—আমি অরিন্দমকে চিনি !—'

'চেনেন ?—'

'হাঁ ! চিনি !

'তবু—তবু আপনি অরিন্দমকে এখনো ধরিয়ে দিচ্ছেন না ?'

'ব্যাপারটা আপনি যতখানি সহজ মনে করেছেন, ঠিক ততটা সহজ নয় ! আইন বড় সাংঘাতিক বস্তু। সামান্য সন্দেহ, রাগ বা বিদ্বেষের বশে হুট্ করে কাউকেই কি গ্রেপ্তার করা যায় ? বিশেষ করে খুনের অভিযোগে ? না তা যায় না ! অরিন্দমকে আপনি যে চোখে দেখেছেন আমি সে চোখে এখনো দেখতে পারছি না।'

'আপনার কথা আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, মিঃ রায় ? '

'ক্ষমা করবেন ! আপনার ডাইরীর সমস্ত কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে আমি বলতে বাধ্য হবো, অরিন্দম আজও আপনাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সত্যিকারের ভালবাসে !'

'ছিঃ ! ছিঃ ! ও কথা আজ আমার শুনতেও ঘৃণা হয়।—'

'ঘৃণা হওয়াই উচিত ! তবে আমার বক্তব্য ঠিক তা নয়— আমার এক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে সত্যিকারের ভালবাসা কখনো

অতখানি নীচে নামতে পারে না। কিন্তু যাক্ গে সে কথা! আমি যখন আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, যে আপনার স্বামীর হত্যা-রহস্যের যাহোক একটা মীমাংসা করবোই, তখন শীঘ্রই সেটা করবো। আমি আজ কলকাতায় যাচ্ছি!'

'আর ফিরে আসবেন না?—'

'তেমন আর প্রয়োজন কি বলুন? নির্মলবাবুও ত' বলছিলেন, আপনাকে নিয়ে শীঘ্রই তিনি কলকাতাতেই যাচ্ছেন।—'

'হাঁ,—সে বলছিল আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে যেতে।—'

'বেশ'ত! সে ত' খুবই ভাল কথা! চলুন না একই ট্রেনে যাওয়া যাবে'খন!—'

'তা হলে নিমুকে বলে আসি গে?—'

সুমিত্রা দেবী ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

—এগার—

—মনের গহণে—

ল্যান্সডাউন টেরাসে সন্তোষ চৌধুরীর সুবৃহৎ আধুনিক আমেরিকান কংক্রিটে তৈরী আবাস ঃ 'চৌধুরী লজ।'

বাড়ীখানা প্রায় নয় কাঠা জমির উপর। বাড়ীর সম্মুখ ভাগে লোহার গেট পার হলেই প্রকাণ্ড টেনিস লন, একপাশে রুচি সম্মত ফুলের বাগান। দেশী বিদেশী ফুলের ও পাতাবাহারের গাছ—রঙিনের বিচিত্র সমারোহ। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকেও একটা ছোটখাটো বাগানের মত আছে। করিডরও পোর্টিকো তারও চতুর্দিকে পিতলের টবে পামট্রি ও অর্কিড। নীচের তলায় চৌধুরীর অফিস।

উপরের তলায় ওরা থাকেন!

* * * *

কিরীটির কাছ থেকে হাওড়া ষ্টেশনেই বিদায় নিয়ে মা ও ছেলে ট্যাক্সীতে করে সোজা বাড়ীতে চলে এলো। বাড়ীতে তারা জানায়নিও যে আসছে তারা ফিরে আজই! পোর্টিকোতে এসে ট্যাক্সী দাঁড়াতেই, সাড়া পেয়ে ভৃত্যের দল চারপাশ থেকে এসে হাজির হলো।

বৃদ্ধ সরকার প্রফুল্লবাবু এগৃহের বহু দিনকার পুরাতন লোক।

প্রফুল্লবাবু এসে সামনে দাঁড়ালেন : বৃদ্ধের দুই চক্ষু অশ্রু-সজল : মা!—আর যে কি বলবেন তিনি মনিব পত্নীকে বুঝতে পারলেন না। তাই 'মা' বলেই চুপ করে গেলেন। সুমিত্রা একবার প্রফুল্লবাবুর দিকে চোখ তুলে তাকালেন কোন জবাব তাঁরও কণ্ঠে নেই! মাত্র মাস দেড়েক আগে সুমিত্রা এই বাড়ী থেকে, স্বামীর সংগে কয়েকমাস মধুপুরের বাড়ীতে থাকবেন বলে গিয়েছিলেন।

অসাধারণ বুদ্ধিমতী সুমিত্রাকে বাইরে থেকে দেখে কারো বুঝবারও উপায় ছিল না, এ সংসারের সর্বময়ী গৃহ কত্রীর আসনটিতে উপবেশন করেও মনের মধ্যে তাঁর আসল এ সংসারের যাবতীয় সব কিছু হতে সুরু করে, মায় মালিকটির প্রতি পর্যন্ত এতটুকু বন্ধন ছিল। এগৃহের সর্বময়ী হলেও তিনি আসলে এ গৃহের কেউ ছিলেন না! সংসারের হালটি তার হাতে থাকলেও, এ সংসারের কেউ তিনি ছিলেন না।

এ সংসারের কোন কিছুর প্রতিই তার সামান্যতম স্পৃহাও ছিল না।

কিন্তু তবু! তবু আজকের প্রভাতে এ বাড়ীর দরজায় পা দিতেই সহসা কেন না জানি, মনের মধ্যে একটা অদৃশ্য হাহাকার জেগে ওঠে।

একটা মর্মান্তিক বেদনার তীব্র দাহে কেন না জানি সমস্ত অন্তরটা তাঁর হা-হা করে ওঠে। আজ প্রায় দীর্ঘ বাইশ বছর

ধরে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে যার সহধর্মিনী কল্পনা মনে মনে স্বীকার করে নিয়েও অন্তরে কোন স্বীকৃতিই ে
অপরিমেয় শুভেচ্ছা ও ভালবাসাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে
অবজ্ঞায় অস্বীকার করে এসেছেন—আজ তাঁরই অবর্তমানে তাঁরই গৃহে পা দিয়ে অকারণ মূক বেদনায় যেন, তার সমস্ত অন্তর কেঁদে উঠলো। দোষ কি কেবল একা তাঁরই ছিল ?

কর্তব্যের দিক দিয়ে মনের কাছে তিনিও কি দোষী নন ?

কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতেই সুমিত্রা পায়ে পায়ে এসে স্বামীর নিত্যকার ব্যবহারে বন্ধ ঘরটির দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

সামনেই স্বামীর এন্‌লার্জ ছবিখানা।

যেন তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন।

সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে ঠিক ছবির সামনা সামনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

নির্বাক প্রাণহীন ছবির চোখেও কি ভাষা ফোঁটে !

একদিন সমস্ত অন্তর দিয়েই'ত ওই মানুষটিকে সুমিত্রা ভাল বেসেছিলেন ?

চির সুখের নীড় বাঁধবার জন্য ঐ মানুষটির হাতে হাত মিলিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু কেন—কেন! কেউত জানতেন না ভালবাসার অম্লান গন্ধপুষ্পের মধ্যে অভিশপ্ত কালো কীট আত্মগোপন করে আছে !

সত্যিই কি সে বিশ্বাস ঘাতক !

দেশদ্রোহী !

বৃদ্ধ সরকার ছিল তার নিজের ঘরে বাগানের দিককার খোলা
প্রফুল্ল সামনে দাঁড়িয়ে : সামান্য কয়টা দিনের মধ্যে কোথা
সঞ্জ ।কি হয়ে গেল !

একটা প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় সব কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

ভাল করে জ্ঞান হবার সংগে সংগেই প্রায় পিতার প্রতি তার মন বিষিয়ে উঠেছিল। অথচ পিতা তাকে কি স্নেহই না করতেন!

তার অবজ্ঞা অবহেলা—কোনদিন তার জন্য পিতা এতটুকু অভিযোগও করেননি! নিঃশব্দে আজ তিনি সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত অবহেলা চিরতরে মাথায় তুলে নিয়ে নৃশংস ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়ে গেলেন।

তাকেই আজ তাঁর পিতার হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে!

সত্যিইত' সে নির্দোষ নয়।

অন্তরে কি তার পাপ ছিল না?

মনে মনে সেও কি পিতার মৃত্যু কামনা করে নি!

মার ব্যথা করুণ মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে কত সময়কি তার মনে হয়নি, কর্তব্যের এই মর্মান্তিক দুঃখ সহে থাকার চাইতে নিজ হাতে সে সব মীমাংসা করে দেবে?

হাঁ! আজ অস্বীকার করতে সে পারবে না : মনের ঘুমন্ত পশু তারও নখ বিস্তার করছে থেকে থেকে!

দোষী! হাঁ! সেও দোষী বইকি!

হত্যা করা ও কাউকে হত্যা করবার পরিকল্পনা মনে মনে পোষণ করা, একই অপরাধ বৈকি!

দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢাকে নির্মল!

রায়বাহাদুর সত্যেন ব্যানার্জীর মেয়ে মৃণালিনী।

সেও তার নিজ শয়ন কক্ষে একটা সোফার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল। এই কয়দিনেই তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

মুখের সে সুষমা নেই!

নেই দেহের সেই ঢলঢল কমনীয় লাবণ্য!

দুঃখের দারুন তাপে যেন সব শুকিয়ে ঝলসে গেছে।

মাথার পর্যাপ্ত কেশ আলু থালু বিস্রস্ত! চোখের কোলে সুস্পষ্ট কালো রেখা।

তপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যতাপে ঝলসান রজনীগন্ধার ফুলটি যেন।

সদা ক্রীড়া ও হাস্যময়ী মৃণালিনী ঝর্ণার স্বচ্ছন্দ ধারার মত যার হাসির তরংগ দিবারাত্র সমস্ত বাড়ীটাকে আনন্দ মুখর করে রাখতে, সে হাসির উৎস মুখে যেন পাথর চাপা পড়েছে।

একটা দিন মৃণালিনী বাড়ী থেকে একটিবারের জন্য কোথাও বেরও হয়নি পর্যন্ত।

অনিলবাবু অবিশ্যি এবাড়ীতেই আছেন তবে মৃণালিনী তার সংগে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলে না।

বরং এড়িয়েই থাকতে চায়।

একা একা চুপটি করে ঘরের মধ্যে থাকতেই ভাল।

পিতা শুধু মৃণালিনীর পিতাই ছিলেন তা নয়, সখা সচিব! মেয়েকে রায়বাহাদুর অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে অন্তরের সমস্তটুকু স্নেহ নিংড়ে গড়ে তুলেছিলেন।

পিতার কাছে মৃণালিনী কোন দিন এতটুকুও সংকোচ বোধ করেনি।

যে কথা সমবয়সীদের কাছে এবং একান্ত অন্তরঙ্গদের কাছেও বলতে বেধেছে, পিতার কাছে অসংকোচে সে কথা সে বলতে দ্বিধা বোধ করেনি।

সেই পিতার মৃত্যুর আঘাত কি এত সহজে ভোলা যায়!

সমস্ত সংসারই যেন আজ মৃণালিনীর কাছে শূন্য হয়ে গিয়েছে। একটিমাত্র লোকের অভাবে তার জীবন যেন শূন্য হয়ে গেছে একেবারে।

ঠাকুরমাকে মধুপুরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনিও নাকি শয্যা নিয়েছেন।

•

কিরীটি তার শয়ন কক্ষে শয্যার 'পরে শুয়ে ভাবছিল : ঘটনার আকস্মিক দ্রুত গতিবেগের কথাই।

বহু জটিল সূত্র যেন একসংগে জট খুলে কেমন তাকে বিহ্বল করে ফেলেছে।

সুমিত্রার নিঃসংগ একাকীত্ব তাকে আজ সত্যিই কেন যেন ভীত করে তুলেছে।

সুমিত্রার মত মেয়েলোক, এই চরম আত্মস্খালনের পর যে বিপর্যয়ের সম্মুখে এসে তাকে বাধ্য হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে, আজ সে বিপর্যয়ের বেগকে দেহ ও মন সহ্য করতে পারবে কিনা, সেটাই কিরীটির সবচাইতে বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে যে সংগ্রামকে সত্য বলে সে দেহ ও মনে যুদ্ধ করে এসেছে, আজ তার সত্যতার সংশয়ে যে অন্তর্বিপ্লব তাঁর মনে জেগেছে তাকে সহ্য করবার মত শক্তি কি তার আছে?

অথচ আজকার এই হত্যারহস্যের মীমাংসার পর চারিদিক বজায় রাখতে হলে, বিশেষ করে আগামী দিনের দুঃখ হতে, সকলকে বাঁচাতে হলে সুমিত্রাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

প্রফুল্লবাবু এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন মৃদু সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: আমাকে ডেকেছিলেন মা?

দরজার বাইরে প্রফুল্লবাবুর গলা শুনে ঘরের ভিতর থেকে সুমিত্রা মৃদু আহ্বান জানালেন: আসুন—ঘরের ভিতরে আসুন সরকার মশাই!

প্রফুল্লবাবু ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন; সুমিত্রার দিকে চেয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বিগত যৌবনা সুমিত্রাকে দেখলে এখনো ভুল হয় না, অসাধারণ রূপবতী ছিলেন তিনি যৌবনে!

ইতিমধ্যে কখন স্নানান্তে একখানা শাদা পাড়হীন সিল্কের সাড়ি পরিধান করেছেন।

রুক্ষ সিক্ত চুলের রাশি পৃষ্ঠ দেশে ছড়িয়ে আছে, মাথায় অল্প ঘোমটা।

হাত দু'টি এখন সম্পূর্ণ নিরাভরণা।

সমস্ত গহণা ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেছে সে।

অপূর্ব যোগিনীবেশ।

প্রফুল্লবাবুর চোখের পাতা জলে ভরে আসে ঃ মাথা নীচু করলেন প্রফুল্লবাবু, বোধ হয় উদ্যত অশ্রুধারকেই নিরোধ করতে।

এবাড়ীর প্রতিটি লোক সুমিত্রাকে সত্যিই ভালবাসতো সুমিত্রার মিষ্ট মধুর ব্যবহার, সংযত স্নেহশীল আচরণ সকলকেই আকৃষ্ট করতো।

'সরকার মশাই—আপনি বোধ হয় শুনেছেন আমার স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর আত্মার সদগতির জন্য যা করা প্রয়োজন সব কিছু ব্যবস্থা করুন। নির্মলত' ওসব ব্যাপারে কিছুই জানেনা। যদি কোন পণ্ডিতের কাছে পরামর্শ নিতে হয়—

'সব ব্যবস্থাই হবে মা! ছোটবাবুকে ভাবতে হবে না আপনিও নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'এই জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম—হাঁ! আর

একটা কথা সেক্রেটারীবাবুকে অফিসে একটা সংবাদ দেবেন, আমরা কলকাতায় হঠাৎ চলে এসেছি। তিনি যেন আজ সন্ধ্যার পরে এখানে একবার এসে দেখা করেন আমার সংগে। বিশেষ প্রয়োজন আছে !—'

'আচ্ছা মা !—'

এরপর প্রফুল্লবাবু ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নির্মল কিছুতেই নিজের ঘরে চুপ করে থাকতে পারলে না : বিকালের রোদটা একটু পড়ে আসতেই সে বের হয়ে পড়ল গাড়ী নিয়ে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে : কোন দিকে যাবো বাবু ?

'রায়বাহাদুরের বাড়ীতে চল !—'

গাড়ী রায়বাহাদুরের বাড়ীর দিকেই চলল।

—বার—

—অতীতের আর এক পৃষ্ঠা—

সন্ধ্যার আবছা আলোয় চারিদিক তখন ম্লান হয়ে আসছে।

রাস্তার ইলেট্রিক বাতিগুলো জ্বলতে সুরু হয়েছে।

গাড়ী হতে নেমে নির্মল সোজা উপরে মৃণালিনীর ঘরের দিকে চলল।

সন্ধ্যার ম্লান ও স্বল্প আলোয় কক্ষটা প্রায়ান্ধকার বললেও অত্যুক্তি হয় না।

খোলা জানালা পথে শেষ আলোর যে সামান্য একটুখানি কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে, তাতে ঘরের ভিতরে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

নির্মল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটু ইতস্ততঃ করে ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ অন্ধকারে মৃণালিনীর গলার স্বর শোনা গেল : কে ?

'মীনু—আমি নির্মল !—'

'নির্মল !—' চমকে মৃণালিনী উঠে দাঁড়ায়।

এগিয়ে এসে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিতেই মুহূর্তে উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হলো।

মৃণালিনী সামনে নির্মলকে দেখে কম বিস্মিত হয়নি। নির্মল পিতৃহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তারই হয়েছিল জানত, কিন্তু জামিনে যে সে এর মধ্যে খালাস পেয়েছে, তা কিছুই জানত না।

'অবাক হয়ে গেছো না? হাঁ কিরীটিবাবুর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত জামিনে খালাস পেয়েই মাকে নিয়ে এসেছি!—'

'মা কলকাতায় এসেছেন?—'

'হাঁ! তাঁকে আর মধুপুরে রাখতে সাহস হলো না! '

'আমাদের কথা তিনি শুনেছেন?'

'না! এখনো তাঁকে কিছু বলিনি। আমিত' কিছু জানতাম না। কিরীটিবাবুর মুখেই সব শুনলাম। '

'বোস নির্মল! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? '

নির্মল একটা সোফার' পরে উপবেশন করে।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সত্যিই নির্মল, মৃণালিনীর অসাধারণ মনের শক্তি দেখে। সে ভেবেছিল প্রথম দর্শনেই হয় মৃণালিনী দুঃখে ও শোকে ভেংগে পড়বে না হয় কোন কথাই বলবে না এবং সারাটা পথ সে ভাবতে ভাবতে এসেছে কি ভাবে কথা যে ও সুরু করবে?

মীনুর পিতার নিহত হবার সংবাদ শুনবার পর হতেই এই কথাটাই ও 'বার বার ভেবেছে এই দুর্ঘটনার পর মীনুর সংগে প্রথম সাক্ষাতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার সম্মুখীন সে হবে কি করে? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসে সম্পূর্ণ

বিপরীত দেখে ও যে শুধু হতভম্বই হয়ে গেছে তা নয় সম্পূর্ণ দিশেহারাও হয়ে গেছে।

কি ভাবে ঠিক কোথা হতে কথা সুরু করবে নির্মল ভাবছিল ; কিন্তু তাকে এই সংকটময় পরিস্থিতি হ'তে মুক্তি দিয়ে মীনুই নিজ হতে প্রথমে কথা সুরু করলে : আমার বাবার অতীত জীবনের কথা তুমি সঠিক জান কিনা আমি জানিনা, নির্মল—'

'কিছু কিছু জানি, তোমার বাবা ও আমার বাবা প্রথম যৌবনে এক গুপ্ত বিপ্লবী সংঘে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন জানি।'

'সেইটুকুই সব নয়। এ সম্পর্কে একটা খোলাখুলি আলোচনা করবার জন্যই এবারে তোমাকে আমি মধুপুরে যেতে বলেছিলাম, কারণ সেই আলোচনার 'পরেই নির্ভর করছিল একান্তভাবে আমাদের দু'জনের জীবনের ভবিষ্যত। তুমি বলেছিলে তোমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে যেগুলো সেরেই তুমি আসবে, কিন্তু আচমকা কোথা হতে ঝড় এসে সব ওলট পালটে করে দিয়ে গেল। এখানে ফিরে এসে দ্বিতীয়বার ঝড় উঠলো যার ফলে সমস্ত আশা ভরসা আমার শেষ হয়ে গেছে।'

'শেষ হয়ে গেছে কেন বলছো মীনু?'

'বলেছি তার কারণ সত্যিই শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ভবিষ্যত জীবনকে কেন্দ্র করে যে পরিকল্পনা আমি গড়ে

ভুলেছিলাম আজ আর তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই! সব, সব শেষ হয়ে গেছে।'

'কিছুই শেষ হয়নি মীনু! তাছাড়া নিয়তির গতি রোধ করতে পারে মানুষের সাধ্য কি?'

'নিয়তি! নিয়তিই বটে নির্মল! যাক! তুমি নিজে থেকে এসেছো ভালই হয়েছে। নাহলে আমাকেই হয়ত শীঘ্র একদিন তোমার কাছে যেতে হতো! তারপর একটু চুপ করে কি যেন ভাবে মৃণালিনী! তার সুসংযত চিন্তান্বিত মুখের রেখায় রেখায় একটা অনিবার্য দৃঢ়তা যেন ফুটে ওঠে। হঠাৎ কণ্ঠস্বরকে অত্যন্ত নীচু ও সুস্পষ্ট করে মৃণালিনী ডাকে: নির্মল?

'বল?'

'তোমাকে কেন দেখা করতে বলেছিলাম জান?'

'কেন?'

কথাটা আমাদের দু'জনের পক্ষেই লজ্জার, কারণ এমন চারজন এর মধ্যে জড়িয়ে আছেন, যাঁদের কাছে আমরা সর্বতো ভাবেত' ঋণীই এবং যাঁদের চাইতে ভালবাসার ও শ্রদ্ধার ব্যক্তি আমাদের উভয়েরই আর কেউ হতে পারে না। বুঝতে পেরেছো বোধ হয়, আমি কি এবং কাদের কথা বলতে চাই? তোমার ও আমার মা বাবা। আজ অবিশ্যি চার জনের মধ্যে মাত্র একজনই বর্তমান! তোমার মা! তাঁরা অন্যায় করেছিলেন কি ভুল করেছিলেন, সে তর্ক বা বিচার আমাদের নয়,—'

'এসব কথা এখন থাক মীনু !—'

'না—নির্মল ! আমাকে বলতে দাও এবং শেষ করতে দাও ! বাবাকে আজও আমি শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি এবং যতদিন বেঁচে থাকবো মানুষ হিসাবে তাঁর স্মৃতিকে চির দিন অকুণ্ঠিত প্রণাম জানাবো। কারণ সত্যিকারের মানুষের কর্ম বহু ব্যাপৃত ! বহু বিস্তৃত! সেই বিস্তৃত কর্ম থেকে বাদ দিয়ে একটি ভগ্নাংশকে নিয়ে কোন একজন মানুষকে বিচার করতে গেলে বস্তুত তাঁর প্রতি অন্যায়ই করা হবে। তাছাড়া তুমি জান বাবা আমার কাছে কতখানি ছিলেন? জীবনে তিনি আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন। নিঃসংকোচে চির দিন তাঁর সংগে আমার সকল প্রকার আলোচনাই চলত।'

'আমি জানি !—

'না ! সবটুকু তুমি জাননা নির্মল, বছর খানেকও হবে না, মাস আষ্টেক বোধ হয় হবে, একদিন বাবা একখানা চিঠি পান। চিঠিটা পাবার দিন দুই বাদে একদিন রাত্রে আহারাদির পর শুতে যাবো, বাবা আমাকে তার শয়ন কক্ষে ডেকে পাঠালেন ! আমি ঘরে যেতেই বললেন : বোস মীনু, আজ তোমাকে কতকগুলো বিশেষ কথা বলবার জন্যই এসময়ে ডেকে পাঠিয়েছি।

মীনু বলতে লাগল আবার : চিঠিটা পড়ার পর থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম বাবা যেন কেমন বিষণ্ণ ও সর্বদা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে আছেন। মনের মধ্যে যেন তাঁর প্রচণ্ড একটা অন্তর্বিপ্লব চলেছে। বললাম : কি এমন কথা বাবা ?

বাবা বললেন : বোস মা—সব তোমাকে খুলে আজ রাতে বলবো বলেই ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি আমার কন্যার চাইতেও অধিক। অনেকদিন ভেবেছি সব কথা তোমাকে খুলে বলবো, কিন্তু কেন না জানি একটা সংশয় জনিত কুণ্ঠা আমার কণ্ঠকে চেপে ধরেছে! অথচ সর্বদাই মনে হয়েছে, এ কথাটা তোমার কাছে এখনো গোপন রাখা আমার পক্ষে শুধু অন্যায় নয় পাপ। এবং আমার তোমার প্রতি কর্তব্যের একটা গুরুতর ঘাটতি। প্রত্যেক সন্তানের যেমন তাদের মা বাপের প্রতি একটা কর্তব্য আছে, আছে একটা দায়িত্ব তেমনি প্রত্যেক মা বাপেরও তাদের সন্তানের প্রতি আছে একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য। বলতে বলতে বাবা কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ চেয়ার হ'তে উঠে পড়ে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।

মীনু বলতে লাগল :

বাইরে অন্ধকার রাত্রি। রাতও অনেক হয়েছে—বাইরের গোলমাল ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে, ঘরের মধ্যে সবুজ ঘেরটোপে ঢাকা টেবিল ল্যাম্পটার ম্রিয়মাণ আলো, সমস্ত ঘরটার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আলো ছায়ার সৃষ্টি করেছে। ঘরের মধ্যে চেয়ারের পরে বসে আমি। বাবা পায়চারী করছেন নিঃশব্দে। আজও স্পষ্ট মনে আছে বাবার দীর্ঘ মূর্তিটা সেই স্তব্ধ আলো ছায়ায় যেন কেমন করুণ ও নিঃসংগ মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ বাবা পায়চারী থামিয়ে বলতে সুরু করনে : আমি জানি মা—তুমি আমাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করো, ভালবাস। এবং এও জানি সেই অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রের হঠাৎ যখন কোন ঘটনা বিপর্যয়ে তাঁর ভালর মুখোসটা খুলে যায়—যে তাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে তখন তার চোখে তাকে কি মর্মান্তিক বেদনা ও গ্লানি নিয়েই না দাঁড়াতে হয়। তবু! তবু—আজ তোমাকে আমার সব কথা খুলে বলতেই হবে। এবং সব কিছু শুনবার পর আমার সম্পর্কে যে ধারণাই তোমার হোক না কেন, জানবে সেটা আমি সন্তুষ্ট মনেই গ্রহণ করবো।

আমি বললাম : বাবা আপনি কি মনে করেন আপনার মেয়ে এতই অপদার্থ।

'না মা! তা ভাবি না! আর ভাবিনা বলেই না আজ অকপটে সব কথা তোমার কাছে স্বীকার করবো। প্রথম জীবনে ঘটনাচক্রে আমাব মনকে বিপ্লবের মত ও পথ, তীব্র ভাবে আকর্ষণ করেছিল। অন্তরের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, একাগ্রতা ও পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়েই বিপ্লবীর দলে আমি নাম লিখিয়েছিলাম। বিপ্লবীর আদর্শই ছিল আমার আদর্শ। কিন্তু হঠাৎ সেই আদর্শের মূলে লাগলো আঘাত। তোমার মা এসে আমার জীবন পথে দাঁড়ালেন। শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবে তোমার মাও সেই বিপ্লবী দলেরই ছিলেন একজন সভ্যা। যদিচ আমাদের উভয়ের আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাটা গড়ে উঠেছিল সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের মধ্যদিয়েই—তিনি জানতেন না যে একই বিপ্লবী দলে

তিনি ও আমি আছি, অবিশ্যি আমি জানতাম যে, তিনি সেই বিপ্লবী দলে আছেন। তোমার মার বাহ্যিক রূপের চাইতে তাঁর স্বভাবের সহজ ও সরল প্রীতিই আমাকে আকর্ষণ করেছিল, একান্ত ভাবে তাঁর প্রতি! বলে একটু থেমে আবার শুরু করলেন; এবারে যে কথাটা বলবো আমাদের উভয়ের অর্থাৎ তোমার মা ও আমার জীবনে সেটাই সব চাইতে বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার; যে তথ্যটা আমি আমাদের বিবাহের এবং তোমার জন্মের 'পরে অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম। এই পর্যন্ত বলে বাবা কিছুক্ষণ আবার যেন কি ভাবলেন—তারপর আবার বলতে সুরু করলেন—শেষের দিকে তোমার মা জানতে পেরেছিলেন যে আমিও তাদের দলের একজন তবে একটা ভুল করেছিলেন। আমাদের বিপ্লবী দলের সর্বাধ্যক্ষ ১নং য়ের সম্পর্কে আমার identity ভুল করেছিলেন এবং সেই ভুলের বশবর্তী হয়েই পরে আমি জানতে পারি আমার প্রতি তার প্রীতি ও ভালবাসা জন্মায়। বাইরের জগতে আমি সত্যেন নামে পরিচিত থাকলেও দলের মধ্যে ১নং য়ের মুখোসের অন্তরালে যে আমিই সেই ব্যক্তি এ তাঁর অবধারিত ধারণা জন্মেছিল। আরো একটু খুলে বলি—বস্তুত তিনি ১নং মুখোস ধারীর প্রতিই আকৃষ্ট হ'য়ে ব্যবহারিক জীবনে আমাকে সেই ১নং ভুল করে আমার সংগে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন। অবিশ্যি সত্যি কথাই বলবো এ ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও আমি জানতে পারিনি বহুদিন পর্যন্ত। তুমি জান তোমার মা সুচিত্রা ও নির্মলের মা সুমিত্রা বহুদূর সম্পর্কীয়া

মামাত পিসতুত বোন এবং তোমার মা সুমিত্রার বাবার কাছেই ছোট বেলা হ'তে মানুষ। সুচিত্রা ও সুমিত্রার পরস্পরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন ছিল। একে অন্যের ছায়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওদের বাড়ীতে আমি যাতায়াত করতাম। তার কারণ ওদের বাড়ীতে আমারই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলে থাকত, সে ছিল আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু এবং সহপাঠী।

জীবনে—আর তার দেখা পাবো না।

তার মত—অতবড় প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মনন শক্তি কর্মী সত্যিই খুব বিরল! তাকে কেবল যে আমি প্রাণের সংগে ভালই বাসতাম তা নয়—তাকে শ্রদ্ধা করতাম।

তাকে পূজা করতাম। এককথায় সেই ছিল আমার তখনকার আদর্শ! আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রধান ১নং—পরে যার নাম জেনেছিলাম অরিন্দম—সে ছিল আমার ঐ বন্ধুটির পরম বন্ধু! আমার ঐ বন্ধুটির কথাতেই আমি বিপ্লবী দলের প্রতি আকৃষ্ট হই এবং তারই সুপারিশে ও উদ্যোগে একদিন অরিন্দমের সংগে দেখা করে কপালে রক্ততিলক ধারণ করে দলভুক্ত হই।

জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

সে যে কি একটা উন্মাদনা—কি অভূতপূর্ব একটা প্রেরণা যা আমার সমস্ত কল্পনা ও চিন্তাধারাকে তখন এক প্রবল ঝড়ের দোলায় দুলিয়ে গেল। প্রথমটায় সত্যিই আমি

অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, সমস্ত দিন রাত্রি যেন একটা উন্মাদ নেশার মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকতাম।

বাবা একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন: ঠিক এরই কিছুকাল পরে হঠাৎ আমার বিপ্লবী জীবনের মধ্যে এসে ধাক্কা দিল আর একটি ঝড়ের দোলা।

তোমার মার সংগে আমার পরিচয় হলো সে কথা আগেই বলেছি।

বলতে গেলে তোমার মা আমার চাইতে খুব বেশী ছোট নন বয়সে এবং আমাদেরই এক শ্রেণী নীচে পড়তেন।

ক্রমে তোমার মার সংগে আলাপটা ও পরিচয়ের সূত্রটা দৃঢ়বদ্ধ হ'তে লাগলো—দিনের পর দিন।

জীবনের একটা দিক যেমন তোমার মার মধুর সাহচর্যে প্রেমে ভালবাসায় ও আশায় ভরে উঠতে লাগলো, অন্য দিকটায় অর্থাৎ আমার বিপ্লবী জীবনটা তেমনি যেন আমার কাছে ক্রমে ফাঁকা ও নিরস হয়ে আসতে লাগলো।

একদিকে বিপ্লবী জীবনের চরমতম সংকট দুর্দশা ও অনিশ্চয়তা অন্যদিকে জীবনের সাফল্য-প্রেম-ভালবাসা ও সুখ ও নিশ্চিন্তের নীড়।

নিরন্তর এই টানা পোড়েনে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি হঠাৎ এমন সময় জানতে পারলাম তোমার মাও আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সংগে সংযুক্ত! নিজের দিক দিয়ে যে লজ্জা ছিল আজ তার সমস্ত ব্যবধানটা যেন মুহূর্তে ভেংগে

সমভল হয়ে গেল। অসংকোচে তোমার মার কাছে এগিয়ে গেলাম।

জানালাম আমার দাবী !

তোমার মাও আমাকে সানন্দে গ্রহণ করলেন।

ঠিক করলাম বিপ্লবী দল ছেড়ে দিয়ে সংসারী হবো।

দলপতি অরিন্দমকে সব কথা খুলে বলে, আলাদা আলাদা করে আমরা সংঘ হতে বিদায় চেয়ে নেবো।

একদিন অরিন্দমকে মিটিংয়ের পর গোপনে আড়ালে ডেকে সব কথা খুলে বললাম। আমার কথা শুনে অরিন্দম কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো একটি কথাও বললে না। শেষে বললে : আজ নয় দিন পনের বাদে তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেবো।

সমিতির একটা বিশেষ ব্যাপারে আমি এখন ব্যস্ত আছি, তার একটা সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তোমার এ সব কথা ভেবে দেখবার আমার সময় হবেনা ভাই।

হায় রে! তখন কি জানি অরিন্দমই জীবনের আমার সব চাইতে বড় শত্রু !

আমার জীবনের পথে ধূমকেতু হয়ে সে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমার সুখের ঘরে সে আগুন জ্বালিয়ে দেবে ?

সে নিজেই সুচিত্রাকে ভালবাসে !

বাবা আবার কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে নিঃশব্দে পায়চারী

করলেন। কতবড় মর্মপীড়ার ঝড় যে তখন তার মনের মধ্যে বইছিল, তাঁর মুখের রেখায় রেখায় সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

দুঃসহ একটা যাতনায় তিনি তখন সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

বাবা আবার বলতে লাগলেন : আমাদের উভয়ের পরামর্শ মত সুচিত্রাও (তোমার মা) অরিন্দমকে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন। তাকেও অরিন্দম ঐ একই জবাব দিয়েছিল। কিন্তু পনের দিনও কাটল না। অকস্মাৎ শান্ত নীল আকাশে ঝড়ের মেঘ দেখা দিল চারিদিক কালো করে।

বিহারের এক ছোট পল্লীতে এক জরুরী গুপ্ত অধিবেশনের পরোয়ানা এলো দলপতির কাছ থেকে।

মিলিত হলো সকলে : সে অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল, দলপতির সন্দেহ হয় সমিতির কতকগুলো দলিল সংক্রান্ত ব্যাপারে দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারই বিষয় আলোচিত হচ্ছে, এমন সময় পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করে। খণ্ড যুদ্ধ বেধে যায় দু'পক্ষে : কয়েকজন দলের মারা পড়ে, বাকী সব গা ঢাকা দেয়।

নির্মল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মৃণালিনীর কথা শুনছিল।

সে প্রশ্ন করে : তারপর ?

মৃণালিনী আবার সুরু করে : বাবা বলতে লাগলেন : এবারে তোমাকে মা—সেই কথাই বলবো যে জন্য আজকের রাত্রে তোমাকে ডেকে এনেছি। দলপতি অরিন্দমের বিশ্বাস ছিল

জরুরী গোপনীয় দলিলপত্র গুলো সুমিত্রার স্বামী সন্তোষই কোথায় সরিয়ে রেখেছিল এবং দলের মধ্যে সে-ই প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও পরে আমি তার সংগে হাতে হাত মিলাই—পরে তোমার মা যখন আমার সত্য পরিচয়টা পেলেন অর্থাৎ জানতে পারলেন আমি সত্যেন ১নং নয় ১নং অরিন্দম সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি তিনি একদিন সহসা আত্মহত্যা করলেন। তোমার বয়স তখন মাত্র ২।১ সৎসর। আগে ত্ব'খানা চিঠি তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, একখানা পুলিশকে, যে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। দ্বিতীয় খানা আমাকে লিখেছিলেন: তুমি আমার কল্পনার স্বামী নও তাই দ্বিচারিনী হতে পারলাম না। ক্ষমা করো। যাকে ভেবে তোমার গলায় মালা দিয়ে ছিলাম সে তুমি নও!

মৃণালিনী এই পর্যন্ত বলেছে বাইরে মৃতু গলা খাঁকারীর শব্দ শুনে ওরা ত্ব'জনেই—নির্মল ও মিনু—একসংগে চমকে সামনের অন্ধকারে খোলা দরজাটার দিকে তাকাল।

খুট করে একটা মৃতু শব্দ, সেই সংগে ঘরের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করে দপ্ করে ঘরের বিজলী বাতি জ্বলে উঠলো।

—তের—

—ভুলের মাশুল—

অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আচম্‌কা আলোর রশ্মি চোখে লাগায় ; ওরা প্রথমটায় কিছুই যেন দেখতে পায়না ।

'নমস্কার মৃণালিনী দেবী ! নমস্কার নির্মলবাবু !'

ওরা দু'জনেই দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে কিরীটি রায় ।

'কিরীটিবাবু ?' কথাটা বলে নির্মলবাবুই ।

'হাঁ আমিই । অনেকক্ষণ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে গোপনে মৃণালিনী দেবীর কথা শুনছিলাম ।

প্রথমেই অসংযত ব্যবহারের জন্য বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আশা করি ক্ষমা পাবো ?

এতক্ষণে মৃণালিনী কথা বললে : 'বস্থন মিঃ রায় !'

কিরীটি সামনের সোফাটার 'পরে আসন গ্রহণ করে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে : লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার কথাগুলো না শুনলে, হয়ত ঠিক অমনি করে অত সহজভাবে আপনার মুখে সব কিছু আমার শোনা সম্ভবপর হতো না মিস্ ব্যানার্জী ! ত্রুটিটা অসংযত এবং ইচ্ছাকৃত তাই আবার ক্ষমা চাইছি !

'একদিক থেকে ভালই হয়েছে বলতে হবে, মিঃ রায়! আপনি মিনুর সব কথা শুনেছেন, না হলে আমিই হয়ত আজই আপনার ওখানে গিয়ে সব বলতাম। কোথা হতে কতটুকু শুনেছেন আপনি জানিনা তবে—'

'প্রায় সবটাই শুনেছি, যতটুকু আমার শুনবার প্রয়োজন ছিল এবং আশা করছি বাকীটাও মৃণালিনী দেবী বলতে সংকোচ বোধ করবেন না।'

'না আর সংকোচ নেই! সবই বলবো আপনাকে মিঃ রায়'—এতক্ষণে মৃণালিনী কথা বলে।

মৃণালিনী আবার তার অর্দ্ধ সমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে সুরু করে: বাবার জবানীতেই বলছি। আসলে কাগজ পত্র, যেগুলো নিয়ে অরিন্দম আমাকে ও সন্তোষকে সন্দেহ করে প্রথমে সেগুলো সরিয়েছিল দলের একজন, শংকরনারায়ণ ঝাঁ! এবং সেই, পরে সে গুলো সন্তোষের কাছে রাখতে দেয়।'

কিরীটি মৃদুস্বরে বলে: এতক্ষণে শংকরনারায়ণের হত্যার ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হলো! পাটনা হ'তে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম তার মধ্যেও একটু অমীমাংসিত ছিল। তারপর?

'দুর্ভাগ্য সন্তোষও প্রথমে কাগজগুলোর ব্যাপার কিছুই জানতে পারেনি বা সন্দেহ করেনি। আমার পরে সন্তোষের কাছেই শোনা—কাগজের বাণ্ডিলটা সন্তোষের কাছে রাখতে দিয়ে শংকরনারায়ণ তাকে বলেছিল, অত্যন্ত জরুরী ডকুমেণ্টস্ সেগুলো যেন ও খুব সাবধানে গোপন কোন জায়গায় রেখে

দেয়, কারণ বিশস্ত সূত্রে ও জানতে পেরেছে শীঘ্রই তাদের দলে একটা ভাংগন ধরবে। বেচারী সন্তোষ নিজের অগোচরে ঐ কাগজের বাণ্ডিলটা রেখে যে কতবড় বিপদ ও দুর্ভাগ্যকে ডেকে এনেছিল তা টেরও পায়নি ঘুণাক্ষরে। যখন জানতে পারলে, it was too late. অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছে। শয়তান শংকরনারায়ণ কাগজের বাণ্ডিলটা সন্তোষের হাতে দেবার আগেই একটা copy করে সরকারের হাতে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে গোপনে অর্থলোভে পৌঁছে দিয়েছিল।'

'সর্বনাশ ! তবে কি—'

কিরীটির কথায় বাধা দিয়ে মৃণালিনী বললে : হাঁ তাই ! সন্তোষকে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত মাত্র আগাগোড়া শংকর-নারায়ণের সমস্ত ব্যাপারটা। নিজে সাধু সেজে সন্তোষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ফন্দি। And the devil was successful. শংকরনারায়ণই বিহারের সেই অধিবেশনের সংবাদটা বোধ হয় পুলিশের গোচরীভূত করেছিল আগে হতেই— বাবা আবার বলতে লাগলেন : কারণ সে ছাড়া মিটিংয়ের যে পূর্ব পরিকল্পনা হয়েছিল জানবার আর কারো সাধ্য ছিল না। শংকরনারায়ণই ছিল সমিতির সেক্রেটারী। অথচ সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, শংকরনারায়ণ যে কোনদিনও ঐ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে এ যেন সকলের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শংকরনারায়ণ যে কেবল দুঃসাহসী ও অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিল তাই নয়, তার দেশ প্রীতিরও

তুলনা হয় না। দেশকে সে সত্যিকারের ভালবাসত! আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা তাই আমার কাছে প্রহেলিকার মতই হয়ে আছে। যাহোক আমার ধারণা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক শংকরনারায়ণই সন্তোষকে ফাঁসাবার জন্য ওই হীন চক্রান্ত করেছিল। পরে সন্তোষ যখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তখন দলিলগুলো হাতছাড়া করবার আর উপায় ছিল না; কারণ দলের অর্থাৎ সমিতির সভ্যরা ছাড়াও বাইরের জগতে গণ্যমান্য ও সমাজে প্রতিপত্তিশালী এমন অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঐ ব্যাপারের সংগে জড়িত ছিলেন, যাতে তাদের ধরাপড়লে আর দুর্দশার অন্ত থাকতো না! একবার ঐ দলিল সরকারের হাতে পৌছালেই সকলের সর্বনাশ হতো। তাই হয়ত সমস্ত দিক বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত সন্তোষ দলিলগুলো নিজের কাছে গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এদিকে দীর্ঘকাল পরে অরিন্দম অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে পূর্বের সন্দেহের বশেই, সন্তোষের উপরে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলো। সন্তোষকে সে গোপনে পত্র দিল একদিন শীঘ্রই সে দেখা করবে জানিয়ে এবং ঐ সব দলিলের কথা উল্লেখ করে এও লিখেছিল, ঐ সময় দলীলগুলো সম্পর্কেও সে নাকি একটা শেষ মীমাংসা করতে চায়। এই তো গেল সন্তোষের কথা! আমার উপরেও অরিন্দমের যে আক্রোশ থাকতে পারে তা বুঝিনি। একদিন একখানা পত্র পেয়ে বুঝলাম, আমার

প্রতিও তার আক্রোশের অন্ত নেই। কারণ আমিও নাকি সন্তোষের হাতে হাত মিলিয়ে দলের মধ্যে ভাংগন ধরাবার চেষ্টা করেছিলাম। দেশের প্রতি ও সমিতির প্রতি আমিও সেই কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। হঠাৎ সন্তোষের একখানা চিঠি পেলাম। বিশেষ কারণে সে আমাকে তার সংগে এলাহাবাদ যেতে বলে। শংকরনারায়ণ ঐ সময় এলাহাবাদে ছিল, সন্তোষ আমাকে অনুরোধ জানায়, এই ব্যাপারের একটা শেষ মীমাংসা করতেই সে আমাকে নিয়ে শংকর-নারায়ণের ওখানে যেতে চায় এলাহাবাদে। একা শংকর-নারায়ণের কাছে এলাহাবাদ যেতে তার সাহস হয়নি। আমি তার চিঠি পেয়ে জানিয়ে দিই নির্দিষ্ট সময়েই আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি। আমি এলাহাবাদে রওনা হয়ে গেলাম, এদিকে যেদিন ভোর রাত্রের ট্রেনে সন্তোষের মধুপুর থেকে এলাহাবাদ রওনা হবার কথা, সেই মধ্যরাত্রেই সে নিহত হলো অতর্কিত ভাবে। আমি এলাহাবাদে পৌঁছে নির্দিষ্ট হোটেলে সন্তোষের অপেক্ষায় হাঁ করে বসে আছি, সন্তোষ একা আসতে পারবে না, কারণ সে ইদানিং হেমিপ্লিজিয়ার জন্য একা একা হাঁটা চলা করতে পারত না, সেও একটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। এদিকে সন্তোষের সাক্ষাৎ নেই। পরের দিন সকালের 'লীডার' কাগজে সন্তোষের নিহত হবার সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঐ দিনই রাত্রের গাড়ীতে আমি ফিরে এলাম।

এসব কথা তোমাকে আমার বলা প্রয়োজন হতো না, যদি না সন্তোষের এমন অতর্কিত রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হতো, আর ! আর ! যদি না আমি জানতাম সন্তোষের ছেলে নির্মলকে তুমি—একটু থেমে আবার মীনু বলে সন্তোষের আর সুমিত্রার জীবনত' ব্যর্থ হয়েছেই, তোমার ও নির্মলের জীবন যাতে না ব্যর্থ হয়ে যায় শুধু এই জন্যই আজ রাত্রে এ কথাগুলো তোমাকে আমার বলতে হলো। জানিনা, কেন না জানি সন্তোষের অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদটা জানা অবধিই আমার মনে হচ্ছে আমারও দিন বুঝি শেষ হয়ে এসেছে। হয়ত শীঘ্রই আমারও ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে চোখ বুজলেই দেখতে পাই একটা আশংকা—আমার চার পাশে ধোঁয়ার আকারে আমাকে যেন বেষ্টন করে ধরেছে !'

মৃণালিনীর কথা শেষ হলো।

ঘরের মধ্যে কারো মুখে কোন কথা নেই !

মৃত্যুর মত একটা হিম শীতল অখণ্ড স্তব্ধতা যেন থম্ থম্ করছে, ঘরের মধ্যে।

কিরীটিই প্রথমে কথা বলে : কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না মৃণালিনী দেবী, এসব কথা আপনি যদি সর্বপ্রথম আপনার পিতার মৃত্যুর রাত্রেই শুনে থাকেন, তাহলে সে রাত্রে মাঠের মধ্যে এ কাহিনীর কিছুটা, আমাকে কি করে বললেন ?'

কথার জবাব দিল মৃণালিনী নয়, নির্মল চৌধুরী।

সে বললে : মীনু আমার কাছ থেকেই শুনেছিল। গোপনে আমিই একদিন মার ডাইরী পড়ে অতীতের ঐ ইতিহাস জানতে পারি।

'তাহলে এবারে বলুন মিঃ চৌধুরী, আপনার পিতার হত্যার সংবাদ পাওয়ার আগেই, কেন আপনি হঠাৎ মধুপুরে গিয়েছিলেন ?'

কিরীটির প্রশ্নে নির্মল চৌধুরী মাথা নীচু করে থাকে, কোন জবাবই দেয় না।

'বলুন ! চুপ করে রইলেন কেন ?'

'একটা চিঠি পেয়ে গিয়েছিলাম।' ধীর শান্ত কণ্ঠে, মৃদুভাবে জবাব দেয় নির্মল চৌধুরী।

'চিঠি পেয়ে ! কার চিঠি ?'

'জানিনা এক অজ্ঞাতনামা অপরিচিত লোকের !'

'সে চিঠিখানা আছে না নষ্ট করে ফেলেছেন, মিঃ চৌধুরী ?'

'আছে ! আমার সংগেই আছে !'

'সংগেই আছে ? দেখতে পারি কি একবার ? '

নির্মল চৌধুরী জামার বুক পকেট থেকে খামের মধ্যে রাখা একখানা চিঠি খাম সমেতই, বের করে কিরীটির দিকে এগিয়ে ধরে : এই যে সেই চিঠি !

কিরীটি চিঠিখানা খাম থেকে খুলে আলোর সামনে মেলে ধরলো।

আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! এযে ঠিক সেই হাতের লেখা !
অবিকল হুবহু ! একেবারে এক !
সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা

নির্মলবাবু,
যদি আপনি আপনার জীবনকে একেবারে না ধ্বংস করে ফেলতে চান, তবে নিশ্চয়ই এই পত্র পাওয়া মাত্রই মধুপুরে চলে আসবেন। সাক্ষাতে সব কথা হবে। জানবেন আপনার মধুপুরে যাওয়া না যাওয়ার 'পরেই আপনার সমস্ত ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

ইতি : আপনার কশ্চিৎ হিতাকাংখী

চিঠিখানা বার দুই আগাগোড়া পড়ে নির্মল চৌধুরীর হাতে ফিরত দিয়ে কিরীটি মৃদু স্বরে বললে : এ চিঠির কথা আপনি প্রথমে গোপন করেছিলেন কেন এখন আমি বুঝতে পারছি, মিঃ চৌধুরী।

নির্মল চৌধুরী বোধ হয় কিরীটির কথা শুনে শিউরে ওঠে নিজের অজ্ঞাতেই এবং সংগে সংগে বিবর্ণ মুখখানা নীচু করে।

কিরীটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে কিন্তু এড়াতে পারে না নির্মল চৌধুরী : কিরীটি দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় না করে অন্যমনে কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

হঠাৎ আবার একসময় নির্মল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে

কিরীটি মৃদু কণ্ঠে বলে : তাহলে আপনি মিঃ চৌধুরী মধুপুর ষ্টেশন ওয়েটিংরুমে ঐ অজ্ঞাতনামা পত্র প্রেরকের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন বাড়ীতে না গিয়ে, কেমন ?

'হাঁ ! মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় নির্মল চৌধুরী ।'

'দেখা নিশ্চয়ই কারু সংগে আপনার হয়নি ?'

'না !'

হঠাৎ আবার কিরীটি মৃণালিনীর দিকে ফিরে বলে : মিস্ ব্যনার্জী যদি এককাপ চায়ের ব্যবস্থা করেন ?

'নিশ্চয়ই ! আসছি আমি—!'

মৃণালিনী কক্ষ হতে নিস্ক্রান্ত হয়ে গেল ।

ক্রমে অপস্যয়মান মৃণালিনীর দেহের দিকে তাকিয়ে এবারে কিরীটি নির্মল চৌধুরীকে বলে : আচ্ছা মিঃ চৌধুরী ! এখনো কি আপনার স্থির ধারণা, এ দুটো চিঠিই অর্থাৎ যেখানা আমি পেয়েছি ও আপনি যেটা পেয়েছেন আপনার মারই হাতের লেখা ? '

কিরীটি প্রশ্নটা করে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নির্মল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ।

নির্মল চৌধুরী কিন্তু কিরীটির প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না ।

'আচ্ছা মিঃ চৌধুরী ! একটা প্রশ্নের আমার সত্য জবাব দেবেন ?'

নির্মল চৌধুরী নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকাল ।

'সত্যিই যদি আপনার ধারণা হয়েছিল যে এই চিঠির হাতের লেখাটা আপনার মার হাতের লেখার মতই, তাহলে মধুপুরে সে রাত্রে পৌঁছেও আপনার মার সংগে দেখা করেন নি কেন? সর্বপ্রথমে ওই দিক থেকেই ত' আপনার মীমাংসায় পৌঁছান উচিত ছিল?'

'প্রথমে অতটা ভাল করে লক্ষ্য করিনি বলেই হয়ত ও কথাটা আমার মনে হয়নি, পরে আপনার সে রাত্রে হাতের লেখাটা আমি চিনি কিনা প্রশ্ন করায় ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে সন্দেহ হয়। এবং আমার নিজের চিঠিটাও তারপরে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে।'

'হুঁ! আচ্ছা এ সম্পর্কে আপনার ও আপনার মায়ের মধ্যে কোন কথা হয়েছিল কি?

'না! মাকে আমার সন্দেহের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিনি।'

'কেন? কেন করেননি?'

'কারণ চিঠি দু'টিই আমার মার হাতের লেখা বলে সন্দেহ করলেও, এখনো কেন যেন আমার স্থির বিশ্বাস এ হাতের লেখা, মার নয়। মা এ চিঠিগুলোর সংগে আদপেই জড়িত নন।—কোন সংস্পর্শ নেই তাঁর এই চিঠিগুলোর সংগে!'

'তাহলে আপনি অন্য কাউকে সন্দেহ করেন কি?'

কিরীটির এ প্রশ্নে আবার নির্মল চৌধুরী কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে চুপ করে বসে থাকে।

'বুঝেছি! আপনি অন্য কাউকে এই চিঠি তু'টো সম্পর্কে সন্দেহ করেন!'

এবারে কিরীটির সোজা সুজি প্রশ্নে ধীর ভাবে নির্মল চৌধুরী মুখ তুলে কিরীটির চোখের দিকে তাকায়।

তারপর ধীর অথচ শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে: হাঁ করি. শুধু করিই না, জানি এ চিঠি কার লেখা—

'জানেন?—'

'হাঁ জানি—আগে জানতাম না কিন্তু এখন জানতে পেরেছি, দিন তুই হলো। কিন্তু—'

'কিন্তু—?'

'আমার প্রশ্নের আমি জবাব দিতে অক্ষম মিঃ রায়। আমার নিজের হলে কোন কথাই আজ আর ছিল না, কিন্তু—'

নির্মল চৌধুরীর কথা শেষ হলো না—ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রের 'পরে ধূমায়িত তুই কাপ চা নিয়ে মৃণালিনী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করল।

মৃণালিনীকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে নির্মল চৌধুরী অর্দ্ধ পথেই তার বক্তব্য হঠাৎ থামিয়ে চুপ করে গেল।

কিরীটিও আর নির্মল চৌধুরীকে তার অর্দ্ধ সমাপ্ত বক্তব্যটুকু শেষ করবার জন্য কোনরূপ অনুরোধ বা উপরোধ না করে, মুহূর্তে পূর্ব পরিস্থিতি হ'তে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে একেবারে প্রসংগান্তরে উপস্থিত হলো: মৃণালিনী দেবী, সুব্রতর মুখে

শুনলাম, আপনার পিসতুত ভাই অনিলবাবু কলকাতায় এসেছেন। তাঁকে দেখছি না—তিনি কোথায়?

'অনিলদা সকালে বর্দ্ধমানে গেছে, কি একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে!

'ও!—'

উষ্ণ চায়ের কাপে আরাম করে চুমুক দিতে দিতে আবার এক সময় কিরীটি নির্মল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে: মানুষের জীবনে অতর্কিতে অনেক প্রকার বিপদই আসে মিঃ চৌধুরী! বিপদের সময় নিজেকে দৃঢ় ও আত্মসচেতন না রাখতে পারলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এইটুকুই শুধু আপনাকে আমি মনে রাখতে অনুরোধ করবো।

নিঃশেষিত চায়ের কাপটা সামনের ত্রিপয়ের 'পরে নামিয়ে রাখতে রাখতে নির্মল চৌধুরী বললে: একটু পূর্বে আমি যে কথাটা বলছিলাম, হয়ত সবটাই তার আপনি বিশ্বাস করেননি কিরীটিবাবু। কিন্তু সত্যিই আপনাকে বলছি একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও আপনার প্রশ্নের জবাবে আমাকে একান্ত বাধ্য হয়েই চুপ করে যেতে হলো। এমন একজন লোকের সংগে ব্যাপারটা জড়িত যে, যার ব্যক্তিগত চরিত্রের 'পরে, এতটুকু কটাক্ষপাতও আমার কাছে চরমতম দুঃখের ব্যাপার।

'আপনাকে আর কষ্ট করে নিজের অপারগতার দুঃখ জানাতে হবে না মিঃ চৌধুরী। যে সন্দেহটা আপনার কথা শুনেই সর্বাগ্রে মনে আমার উদয় হয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি সেটাই সত্যি!

আচ্ছা আজকের মত তা'হলে আমি বিদায় নেবো মিঃ চৌধুরী! তারপর মৃণালিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে: মৃণালিনী দেবী, আপনার আজকের যে শোক ও তার দুঃখ, মুখের ভাষায় তার সান্ত্বনা দিতে না পারলেও, যাঁর দেওয়া দুঃখ, একদিন যে আবার তিনিই এ দুঃখ হতে আপনাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেবেন, সে আমি জানি এবং জানি বলেই একটা কথা যাবার আগে বলে যাই -আপনার পিতার নৃশংস হত্যার ব্যাপারে আমি—আপনি এর জন্য কোনরূপ অনুরোধ না জানালেও—সাধ্যমত আমার চেষ্টা করবো যাতে হত্যাকারীকে অন্তত বিচারকের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আচ্ছা আজকের মত তা'হলে চলি! নমস্কার! কিরীটি ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল নিঃশব্দে।

ঘরের মধ্যে নির্মল ও মৃণালিনী কিছুক্ষণ নীরবে যে যার আসনে বসে রইলো।

হঠাৎ একসময় হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে নির্মল বলে ওঠে: রাত হলো। আজ তা'হলে আসি মীনু?—'

'এখুনি যাবে? '

'হ্যাঁ, মা একলা আছেন। জানত, বাবার অপঘাতে মৃত্যুর পর হতেই মা কেমন মুষড়ে পড়েছেন। একা একা থাকলেই তিনি যেন কেমন হ'য়ে যান। মার জন্য ইদানিং কিছুদিন হ'তে বিশেষ চিন্তায় আছি মীনু! মার এরকম গম্ভীর শান্ত ভাব পূর্বে কখনো দেখিনি। মাকেই বরাবর দেখে এসেছি কি অসাধারণ

মনোবল! কিন্তু ঐ দুর্ঘটনার পর থেকেই যেন তাকে দেখলে মনে হয়, হঠাৎ তিনি অনেকটা বয়স এগিয়ে গিয়েছেন।'

'খুব বোধ হয় আঘাত পেয়েছেন, ঐ দুর্ঘটনায়!'

'অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির মানুষ বুঝবার ত উপায় নেই। তাছাড়া বাবার প্রতি মার যে ঠিক কি মনোভাব ছিল তাও কোন দিন বুঝিনি। তবে আগে যেমন মনে হতো, মা বাবার প্রতি বেশ কিছুটা উদাসীন, এখন যেন তার ঠিক উল্টোটাই মনে হচ্ছে। বাবার অতীত জীবনের ব্যাপারে মার মনে একটা দুঃসহ কষ্ট ও বেদনা ছিল যার অদৃশ্য বেদনায় সর্বক্ষণ মা, জ্ঞান হওয়া অবধি আমার মনে হয়েছে, নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছেন। এখন তোমার বাবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এসব যখন তিনি একদিন জানতে পারবেন, তখন যে অনুশোচনা তাঁর মনে আসবে সে আঘাত, তিনি সামলাবেন কি করে?

'মাকে নাই বা এ সব কথা বললে নির্মল?—'

'না! তা'হবার নয়, মাকে সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। তা যদি না বলি তা'হলে বাবার জীবিতাবস্থায় যে অন্যায় মা ও আমি তাঁর প্রতি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। সত্যি আমাদের মানুষের বিচার শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি, কত দুর্বল! দৃষ্টিকোণ আমাদের কত ক্ষুদ্র কত সংকীর্ণ। এই সংগে একথাও মনে হচ্ছে কতখানি উদার ও স্নেহশীল ছিল বাবার প্রকৃতি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এত বড় মিথ্যা অভিযোগের জন্য এতটুকু অস্থিরতাও

তাঁর ছিল না। ভেবে আশ্চর্য হই, সব মিথ্যা ও চক্রান্ত জেনেও কেন তিনি চুপ করে ছিলেন এতদিন? কেন তিনি অন্তত মাকে সব কথা খুলে বলেননি!'

'হয়ত ভাবছিলেন, বললেও তোমরা সহজে বিশ্বাস করবে না তাই সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন!'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক—তবু যখন ভাবছি মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও কত বড় মর্মান্তিক কল্পনা নিয়ে তিনি গিয়েছেন—'

'আজ এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কি বল নির্মল? একটা কথা আমার রাখবে নির্মল?

'বল?'

'মাকে সব কথা খুলে বলবার আগে কিরীটি বাবুর সংগে অন্তত একবার পরামর্শ করে—'

'হাঁ—কালই সকালে তাঁর সংগে দেখা করবো—'

—চৌদ্দ—

—শেষ পরিচ্ছেদ—

মানুষ কত অসহায় ! কত নিরুপায় !

অদৃশ্য এক মহাশক্তি যে তাকে কি ভাবে চালিত করে সামান্য এক ক্রীড়নকের মত : মানুষের জীবনের প্রতি-দিনকার ইতিহাসের খুঁটিনাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ !

কয়েক ঘণ্টা আগেরই কথা গুলো।

'এরপর মাকে সর্ব্বাগ্রে সব কথা খুলে বলা ছাড়া আর সত্যি কোন পথ নেই। আঘাত যত বড় ও যত আকস্মিকই হোকনা কেন : এ সত্যকে গোপন করবার তার কোন ক্ষমতা নেই। বলতে তাকে সব হবেই !

ঘরের মধ্যে একাকী সোফাটার 'পরে বসে মৃণালিনী ভাবছিল : চার চারটে জীবন এবং সংগে তার ও নির্মলের জীবনও সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি ভাবে জটীল হয়ে উঠেছে।

কিরীটিও ভাবছিল : খুনী, তার যা প্ল্যান ছিল, নিখুঁত ভাবেই তা শেষ করেছে। কিন্তু তাকে ত' ছাড়া যেতে পারে না।

মানুষের সমাজ জীবনে যদি প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য মানুষকে এত নীচে নেমে আসতে হয় তাহলে সমাজ জীবনের মধ্যে যে ক্লেদ জমা হয়ে উঠবে, যে পাপ ও ব্যভিচার অবাধে চলবে সত্য ও কল্যাণের সমস্ত পথই তা চিরতরে রুদ্ধ করে দেবে।

সমাজ জীবনের শান্তি যাবে, শৃঙ্খলা যাবে।

দুর্নীতির চোরা পথে জীবন যাত্রা হয়ে উঠ্‌বে পংকিল ভয়ংকর!

পাপকে সমাজ থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা যাবে না: কিন্তু পাপীকে তার পাপ থেকে বিচ্ছেদ করতে হবেই!

* * * *

পাপের পথ দীর্ঘ হলেও সংকীর্ণ!

তাই 'কালোপাঞ্জার' রহস্যের পরে নেমে এলো যবনিকা।

রাত্রি বারোটা হবে: একটু আগে নির্মল ফিরে এসেছে!

পনের মিনিট ও হয়নি তার শোবার ঘরের আলোটা নিবেছে এই মুহূর্তটির জন্যই সুমিত্রা বোধ হয় অপেক্ষা করছিল।

আজই সন্ধ্যার ক্ষণপূর্বে একখানা চিঠি সে পেয়েছে অরিন্দমের কাছ থেকে।

সরকার মশাইয়ের হাতে দিয়ে গেছে চিঠিটা কে একজন সাধারণ পত্র বাহক।

সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা:

সুমিত্রা দেবী।

ভগবানের নামে, তোমার মৃত স্বামীর নামে তোমাকে আজ

রাত্রি দেড়টায় ঠিক চাঁপাতলার ৫নং বাড়ীতে—যে বাড়ীতে ২৬।২৭ বছর আগে আমাদের সমিতির অফিস ছিল।—বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আহ্বান জানাচ্ছি। যদি না আসো জীবন ভোর অনুতাপ করতে হবে।

১নং—অরিন্দম।

সরকার মশাই চিঠি খানা এনে মিসেস চৌধুরীর হাতে দিয়ে বলেন: একজন চাকর গোছের লোক এনে এই চিঠিটা দিয়ে গেল মা। বলে গেল—চিঠিটা খুব জরুরী এখুনি যেন আপনার কাছে পৌছে দেওয়া হয়।

সবিস্ময়ে সুমিত্রা সরকার মশাইয়ের হাত হ'তে চিঠি নিয়ে বলেছিল: আমার চিঠি?

'তাই ত বললে—উপরে চিঠিতে ইংরাজীতে টাইপ করেও আপনার নামই লেখা।—'

সত্যি চিঠির খামের উপরে টাইপ করে লেখা ছিল Mrs. Chowdhury.

চিঠিটা খাম ছিঁড়ে খুলে পড়তেই সুমিত্রা চমকে উঠেছিল।

সরকার মশাই প্রশ্ন করেছিলেন: কার চিঠি মা?

সুমিত্রা জবাব দিয়াছিল: হাঁ—আমারই! আপনি যান।

চিঠি খানা পড়ে সুমিত্রা সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমটায় সে স্থির করে উঠ্‌তে পারেনি—কি করবে!

হাজার চিন্তা মনের মধ্যে এসে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল:

অরিন্দম! তার জীবনের আকাশে ধুমকেতু ঐ অরিন্দম! সুখের ঘরে তার, ও আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে। অরিন্দম! অরিন্দম!

কি করেছিল তার সে?

কোন ক্ষতিই ত করেনি!

প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে সুমিত্রা নিজের মনের সংগে নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করেছে—করেছে নিজের মনের সংগে সংগ্রাম। কি করবে সে? যাবে?

শেষ পর্যন্ত স্থির করেছে, হাঁ যাবে!

এবং যাবার আগে কিরীটি বাবুকে একখানা চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিয়ে যাবে। যদি আর সে না ফিরতে পারে?

নির্মলের বিপদ এখনো কাটেনি।

তার স্বীকারোক্তি থেকে যদি তার বিপদ কাটাবার কোন পথ থাকে?

মা হয়ে সে পথ কি সে বন্ধ করতে পারে?

না—না!

রাত বাড়ছে।

গভীর কালো অন্ধকার যেন সমস্ত পৃথিবীকে একেবারে চারিদিক থেকে ঢেকে ফেলেছে।

আকাশে মেঘও করেছে।

দৃষ্টি যেন অন্ধ হ'য়ে যায়।

বাইরের বাগানটা—অন্ধকারে গাছ পালাগুলোর অস্পষ্ট ছায়া চারিদিকে যেন স্তূপ বেঁধে আছে।

অসহ্য গুমোট! কোথায়ও বাতাসের লেশ মাত্রও নেই!

কি ভয়ংকর স্তব্ধতা!

কেউ কি জেগে নেই! সব—সবাই ঘুমিয়ে পড়ল?

সুমিত্রা চিঠিটা লিখে ভৃত্যকে দিয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই কিরীটির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং বিশেষ করে বলে দিয়েছে কিরীটিকে যদি না পাওয়া যায় এমন লোকের হাতে চিঠিটা যেন দিয়ে আসে যাতে করে কিরীটি বাড়ীতে ফিরামাত্রই হাতে চিঠিটা পায়।

কিরীটি প্রায় চলে যাবার আরো ঘন্টা খানেক পরে নির্মল চৌধুরীও বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে; মৃণালিনী তখনও সোফাটার পরে চুপ চাপ বসে: বাইরে পদশব্দ শোনা গেল: কে আসছে।

'মীনু?—' বাইরে অনিলবাবুর গলার স্বর শোনা গেল।

'কে অনিলদা? এসো ভিতরে এসো!' মৃণালিনী আহ্বান জানায়।

মৃণালিনীর ডাকে অনিল এসে কক্ষে প্রবেশ করে: এখনো শুতে যাওনি? বাড়ীতে ফিরে তোমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে—'

'না শুইনি! ঘুম আসবে না এখন বিছানায় শুলেও, তাই বসে আছি।

অনিল মৃণালিনীর পাশেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কি যেন বলতে চায়, কিন্তু তার আগেই মৃণালিনী বলে ওঠে : তোমার না বর্দ্ধমানে যাওয়ার কথা ? যাওনি নাকি ?

'না। বর্দ্ধমানে যাওয়া হলোনা। বিশেষ একটা কাজে—' অনিল বাবুর কথাটা শেষ হলো না নিঃশব্দে করালীচরণ এসে কক্ষে প্রবেশ করলো।

'কি রে করালী ?—' মীনু প্রশ্ন করে।

'কিরীটি বাবু এসেছেন ?—'

'এত রাত্রে ? এখানেই নিয়ে আয় তাঁকে! না থাক চল আমি যাচ্ছি নীচে ; বাইরের ঘরে বসাগে—কফি খান যদি কফি দিবি।

করালী কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মৃণালিনীও উঠে পড়ে।

অনিল বাবু প্রশ্ন করে : কোথায় যাচ্ছ মীনু ? নীচে ?

'না,—মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে—স্নান করবো একবার।—'

'এত রাত্রে স্নান করবে ?—'

'হ্যাঁ শুধু মাথাই নয়, সমস্ত শরীর দিয়ে আগুণ বের হচ্ছে।'

মৃণালিনী ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

•

রাত্রি পৌনে বারটা হবে।

বাইরে নিঃসংগ রাত যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে।

গাড়ী ঘোড়ার শব্দ একেবারে থেমে গিয়েছে। স্নান সমাপনান্তে ভিজা রুক্ষ চুলের রাশ পিঠের' পরে এলিয়ে দিয়ে শয়ন কক্ষের সংলগ্ন বাথ্‌রুমের দরজাটা খুলে হঠাৎ মৃণালিনী চম্‌কে ওঠে: শয়ন কক্ষ তার অন্ধকার; অথচ স্নান করতে যাওয়ার পূর্বেও সে ঘরের আলোটা জ্বেলে রেখে গিয়েছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে ভাববার বা বুঝবারও সময় পায়না ও: অতর্কিতে পাশ থেকে কে যেন ওর মুখে কাপড় দিয়ে ওকে বন্দী করে ফেলে।

প্রথমটায় ঘটনার দ্রুত আকস্মিকতায় মৃণালিনী হকচকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মৃণালিনীর, মুহূর্তে নিজের অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থার কথা মনে করে, অতি সহজেই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিজেকে সে সঁপে দেয়।

ঠিক এমনি সময় দপ্‌ করে ঘরের অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ বাতি আবার জ্বলে ওঠে ও সংগে সংগে কিরীটির কণ্ঠস্বর শোনা যায়: একটু ভুল হয়ে' গিয়েছে স্যার আপনার ক্যাল্‌কুলেশনে, এ ব্যাপারটা আগে হ'তে অনুমান করেই আমি এত রাত্রে এখানে এসেছি। এটুকু অন্তত আপনার বোঝা উচিত ছিল, যে মুহূর্তে এখানে আমি পৌঁচেছি আপনার অভিপ্রায়টি আর খাটবে না।

চকিতে মৃণালিনীও তার আততায়ীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল: কিন্তু আততায়ীকে চিনবার বা জানবার উপায় নেই। সর্বাংগ তার কালো একটা আলখাল্লায় ঢাকা—মুখেও কালো

মুখোস, কেবল মুখোসের ছিদ্র পথে দুটি ক্রুর অন্তর্ভেদি দৃষ্টির ভয়াবহ আভাষ পাওয়া যায়!

আততায়ীর দু'ই হাত কিরীটি সবলে পিছন দিকে মুড়ে আঁকড়ে ধরে আছে দেহের সমগ্র শক্তি দিয়ে।

সুব্রত—শ্রীমানকে বেঁধে ফেল চট্‌পট্‌।

ঘরের মধ্যে সুব্রতও ছিল, চট্‌পট্‌ সে কিরীটির নির্দেশমত আততায়ীকে একটা শক্ত সিল্ক কর্ড দিয়ে শক্ত ও মজবুত করে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে।

'মহাশয় ব্যক্তি! দে সুব্রত ঐ সোফাটার পরেই ওঁকে বসিয়ে দে!—'

সুব্রত টেনে এনে বদ্ধাবস্থাতেই আততায়ীকে সোফাটার 'পরে বসিয়ে দেয়।

মৃণালিনী যেন বিস্ময়ে একেবারে 'থ' বনে গেছে: মুখে একটি টু শব্দ পর্যন্ত নেই। হতবাক—বিমূঢ়!

'মহাশয় ব্যক্তিটিকে চিনতে পারছেন না মৃণালিনী দেবী!—উনি যে আপনার—' কিরীটির কথাটা শেষ হলোনা—পাশের কক্ষে অকস্মাৎ রি-রি-রিং করে টেলিফোন বেজে ওঠে।

'কে?—দেখত সুব্রত—'

সুব্রত পাশের কক্ষে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয়: হ্যালো? কে? নির্মল বাবু? য়্যাঁ—মা নেই!—সব কথাই কিরীটির কানে যায়, পাশের কক্ষের খোলা দরজা পথে। কিরীটি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা সুব্রতর হাত

হ'তে একপ্রকার ছিনিয়ে নেয়ঃ কে? নির্মল বাবু! য্যাঁ, মা নেই! একটা চিঠি—হাঁ, আমি জানি এখুনি যাচ্ছিলাম সেখানে—আসছি। ফোনটা নামিয়ে রেখে কিরীটি সুব্রতকে বলেঃ আপাততঃ আমাদের মাননীয় অতিথি এই ঘরেই বদ্ধাবস্থায় থাকুন—চল এখুনি একবার আমাদের চাঁপাতলায় যেতে হবে। মৃণালিনী দেবী আপনিও চলুন!—'

'হাত পা বাঁধা সেই অবস্থাতেই ঘরের মধ্যে তালাচাবী দিয়ে আততায়ীকে রেখে কিরীটি সুব্রত ও মৃণালিনী তখুনি কিরীটির গাড়ীতে বের হয়ে পড়ে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়—ঘটনার পর ঘটনা, যেন উন্মত্ত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউ একটার পর একটা এসে ঝাপ্টা দিচ্ছে। সব কিছু ওলোট পালোট করে গেল।

*   *   *

নির্দিষ্ট বাড়ীতে এসেছে আজ আবার বহুকাল পরে সুমিত্রা।

আজ তার অংগে পরিচিত নারী বেশ আর নেই; ২৪ বৎসর আগেকার সেই বিপ্লবীর বেশ। মুখে ক্রমিক নম্বর দেওয়া মুখোস। বহুকালের দোতালা পুরাতন বাড়ীটা!

অন্ধকারে যেন মনে হয় নিঃশব্দ কবর খানা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় সুমিত্রা—দৃঢ় পদবিক্ষেপ—সংকোচের কোন বালাই নেই।

দোতালার শেষ সিঁড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল সামনের খোলা দরজাপথে কক্ষ হ'তে আলোর খানিকটা

রশ্মি বাইরে এসে পড়েছে। ভারী গলায় কক্ষ হ'তে প্রশ্ন আসে : কে ?

এ কণ্ঠস্বর সুমিত্রা চেনে : ভুল হবার নয়। দৃঢ় পদক্ষেপে সুমিত্রা সোজা কক্ষ মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে : আমি !

ঘরের মধ্যে ছোট একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছিল একজন মাত্র লোক : তারও সর্বাংগে চব্বিশ বছর আগেকার বিপ্লবীর বেশ, মুখে মুখোস, তাতে ক্রমিক নং ১।

'অরিন্দম ! আমি এসেছি !—'

'এসো সুমিত্রা—আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার পথ চেয়েই বসেছিলাম !

'কিন্তু আর অপেক্ষা করতে হবে না অরিন্দম ! অপেক্ষার আজই তোমার শেষ !

'You are unnecessarily getting excited সুমিত্রা !—'

'Excited ! শোন অরিন্দম ! মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে ! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তুমি আমার পিছনে মূর্তিমান শনির মত আমাকে অনুসরণ করে ফিরেছো। তোমার নিঃশ্বাসে আমার সর্বাংগ জ্বলে গেছে। নিশিদিন তোমার দুঃস্বপ্নে আমি আঁতকে উঠেছি। আজ সেই ঋণ শোধের পালা !

'শোন সুমিত্রা—অধীর হয়োনা। তোমার দীর্ঘ দিনের এ ভুল ভেংগে দিতেই তোমাকে আমি ডেকেছি !

'আগে আমার সব কথা শোন, তারপর বিচার করো।

'বিচার! তোমার বিচার করবেন যিনি, তিনি ভগবান! আমি শুধু তোমার উন্মাদ স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাতে এসেছি!—'

সুমিত্রা চট্ করে কোমর থেকে লোডেড্ রিভলভারটা টেনে বের করলো।

'সুমিত্রা! শোন! শোন! তুমি কি ক্ষেপে গেলে?—'

হাঃ হাঃ করে পাগলের মতই, সুমিত্রা হেসে ওঠে: ক্ষেপে! না এখনো যাইনি! অন্তত তোমার শেষ না হওয়া পর্যন্ত—

সিঁড়িতে একসংগে অনেকগুলো জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

অরিন্দম চম্‌কে ওঠে—ওকি!

'কিছু না—বোধহয় কিরীটি বাবু দলবল নিয়ে এসে পড়লেন, এখানে আসার আগেই তাঁর কাছে চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে এসেছি!—'

'বিশ্বাসঘাতক! Traitor! চীৎকার করে ওঠে অরিন্দম: বিদ্যুৎ গতিতে কোমর থেকে পিস্তল টেনে বের করে।

সংগে সংগে সুমিত্রার হাতের পিস্তল গর্জে ওঠে।

একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠে অরিন্দম। তার হাত থেকে পিস্তলটা খসে মাটিতে পড়ে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুমিত্রা তার বুকের 'পরে পিস্তলটা দ্বিতীয়বার বসিয়ে ট্রিগার টেপে। আবার একটা দুম্ করে শব্দ—সেই সংগে রক্তাপ্লুত সুমিত্রার দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ে।

নিজের যন্ত্রণা ভুলেও, অরিন্দম চীৎকার করে ওঠে: সুমিত্রা! সুমিত্রা!

কিরীটি, সুব্রত, মৃণালিনী তিনজনে এসে কক্ষে প্রবেশ করে।

তাড়াতাড়ি কিরীটি প্রথমেই অরিন্দমকে ধরে তার হাত দু'টো বেঁধে ফেলে।

অরিন্দম কোন বাধা দেয় না; মৃদু হেসে বলে: পালাবো না মিঃ রায়! ভয় নেই—না বাঁধলেও চলতো।

বলতে বলতে অরিন্দমের দেহটা টলে পড়ে যায়।

অরিন্দমও আত্মহত্যা করেছে!

* * *

শোকের বেদনার কালোছায়া নেমে এসেছে।

নির্মল চৌধুরী পাষাণের মত স্থির হয়ে বসে: সামনে তার মার রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ।

মুখোস উন্মোচিত হয়েছে।

'সুব্রত!—' কিরীটি বলে: আমাদের ১নং অরিন্দম, ওরফে শীল মহাশয়, ওরফে আমাদের নির্মলবাবুর মার পিতার অন্নে পুষ্ট সুধাকান্তকে বোধ হয় চিনতে' পারবো ঐ মুখোসটি টেনে খুললেই। কিন্তু আর এখানে কালক্ষেপ করা নয়, এবারে আমাদের আসল হত্যাকারীর কাছে যেতে হবে। মৃণালিনী দেবীর' শয়নকক্ষে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি! যা বলবার সব সেখানে গিয়েই বলবো চল। কিন্তু তার আগে সুমিত্রা দেবীর মৃত দেহের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

'আমি আমাদের গাড়ীতে করে মাকে বাসায় নিয়ে যাই কিরীটিবাবু! মা আমার অনেক দুঃখ পেয়েছেন! একটু আগেও যদি মার চিঠিটার প্রতি আমার নজর পড়তো। হঠাৎ শুতে যাবার পর পিপাসা পাওয়ায় উঠে আলো জ্বেলে জল খেতে গিয়ে টেবিলের 'পরে চিঠিটা দেখতে পাই, চিঠিটা পড়ে মার ঘরে ছুটে গেলাম, কিন্তু তখন ঘর খালি।—'

'অনিবার্যকে ত' ঠেকিয়ে রাখা যায় না নির্মলবাবু! আজকের ঘটনার পর বেঁচে থাকাটা আপনার মার পক্ষে আরো মর্মান্তিক হতো তাই হয়ত তাঁর ভাগ্য বিধাতা, তাঁকে দিয়ে এই ভাবে সব কিছুর মীমাংসা করে দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছিলেন, একদিক দিয়ে এ ভালই হলো। সেই ভালো—মাকে নিয়ে আপনি বাড়ীতেই চলে যান।—'

*　　　*　　　*

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সকলে এসে আবার মৃণালিনীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

আততায়ী তখনও ঠিক তেমনি ভাবে বদ্ধাবস্থায় সোফাটার 'পরে বসে, যেমন ভাবে তারা বসিয়ে রেখে গিয়েছিল।

'বসুন, আপনারা সকলে আমাদের মাননীয় সম্মানিত অতিথির রহস্যোবগুণ্ঠন উন্মোচনের আগে, বর্তমান রহস্যের যবনিকা উত্তোলন করে, সব কথা আগে আপনাদের বুঝিয়ে বলতে চাই।

অরিন্দম বা সুধাকান্ত, সত্যেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ চৌধুরী এরা তিনজনই ছিলেন সমিতির অর্থের ট্রাষ্টি। অর্থাৎ এঁদের জিম্মাতেই সমিতির সংগৃহীত অর্থ প্রায় লক্ষাধিক টাকা, কোন একটি গোপন স্থানে সুরক্ষিত ছিল। শংকর-নারায়ণের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন আচমকা দলে ভাংগন ধরলো, সমস্ত পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, দলের কতকগুলো বিশেষ জরুরী ও একান্ত প্রয়োজনীয়, গোপনীয় দলিলপত্র শংকরনারায়ণ ছল করে সন্তোষ চৌধুরীর হাতে গিয়ে তুলে দেয়। সন্তোষ চৌধুরী জানতে পারেনি ঘুণাক্ষরেও, যে বাণ্ডিলটার মধ্যে আসলে কি আছে। কিন্তু সেত' গেল রহস্যের একটা দিক, অন্য একটা দিক যেটা মিসেস্ চৌধুরীর আজকার চিঠি পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে অন্ধকারাবৃত ছিল, যে রহস্যের মীমাংসা না করতে পারার জন্য, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আসল রহস্যটির কোন কিনারাই করতে পারছিলাম না—যদিও জানতে পেরেছিলাম আসল খুনী কে! কিন্তু খুনীকে ধরতে পারলেও খুনের উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছিলাম না। এবারে আপনাদের আজ রাত্রে পাওয়া মিসেস্ চৌধুরীর চিঠিটা পড়ে শোনাই :

কিরীটি পকেট হতে চিঠিখানা বের করে পড়তে সুরু করে।

কিরীটিবাবু, সম্ভবত এই চিঠি যখন পাবেন—এ দুনিয়ায় তখন আমার সমস্ত সম্পর্কের শেষ—জীবনে যাঁর প্রতি সব

চাইতে বড় অবিচার করেছি যাঁর কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই তাঁর কাছে তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য দাঁড়াবো। আমি জানি আজও তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। চাঁপাতলায় যাবো আমাদের পুরাতন সমিতির বাড়ীতে অরিন্দম আমাকে ডেকেছে।

যাবো তাঁর ওখানে কারণ, শেষ বিদায়ের পূর্বে অরিন্দমের সংগে একটা শেষ বোঝাপাড়া করে যদি না যাই তবে আমার বিবেকের কাছে অপরাধী থেকে যাবো। অরিন্দম আমার জীবনের কুগ্রহ। শুধু আমার জীবনেই তা বলি কেন আমার একমাত্র পুত্র নির্মলেরও কুগ্রহ, তাই যাবার আগে সেই কুগ্রহের শেষ করে যেতেই হবে আমাকে। হাঁ যে জন্য এ চিঠি লিখছি—সেদিন আপনি যখন আমাকে বলেছিলেন সব কথা আপনার নিকট আমি অকপটে খুলে বলিনি, আমি নীরব ছিলাম। আজ আর কোন সংকোচ বা দ্বিধা নেই : আজ বলবো! মাস কয়েক আগে একদিন আমার স্বামী আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, ওঁদের সমিতির লক্ষাধিক কাঁচা মুদ্রা বাংলাদেশের একটা গণ্ডগ্রামে একটা পড়ো উঠানে মাটির তলায় পোঁতা আছে। যার নিশানা ছিল, আমার স্বামীর কাছে যে সমিতির গোপন দলিলপত্র ছিল, তার মধ্যে লেখা! আমাদের দলের যতীন চট্টোপাধ্যায় ছিল পাটনায়! আমার স্বামীর বিশ্বাস যতীন আর শংকরনারায়ণ দু'জনে নাকি পরামর্শ করে সমিতির ঐ অর্থটা পাওয়ার জন্য

বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল সমিতি ভেংগে দিয়ে ঐ অর্থটা দু'জনে ভাগ করে বাটেয়োরা করে নেবে। যতীন চাটুর্যে আজও বেঁচে আছে কিন্তু শংকরনারায়ণ মৃত। সে রাত্রে যারা আমার স্বামীকে হত্যা করতে এসেছিল, মুখে মুখোস এঁটে, যারা আমাকে বেঁধে রেখে আমার চোখের সামনে দিয়ে একঅংগ পক্ষাঘাত গ্রস্থ স্বামীকে, আমার চোখের সামনে দিয়ে অতীব নিষ্ঠুরের মত হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনকে ছাড়া বাকী দুজন—আমার মনে হয় তাদের চিনতে পেরেছিলাম, মুখে মুখোস থাকলেও। একজন, ১নং অরিন্দম; অন্যজন, শংকরনারায়ণ। তৃতীয় ব্যক্তিকে না চিনতে পারলেও আমার সন্দেহ হয় যতীন চাটুর্যে বলে, কিন্তু যতীন চাটুর্যে শুনেছিলাম পক্ষাঘাতে পংগু। ব্যাপারটা তাই আজো আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গিয়েছে। তবু শেষ বিদায়ের আগে শেষ কর্তব্য মনে করে, সব কথাই অকপটে আপনার কাছে জানিয়ে গেলাম। এই সংগে আমার শেষ ভিক্ষাটুকুও জানিয়ে যাই, নির্মলকে আমার দেখবেন। আর, আর আমি জানি মীনুকে সে ভালবাসে, পারেন ত' তাদের মিলনের গ্রন্থিটুকু আপনি বেঁধে দেবেন, বিদায়! নমস্কার। ইতি—

চিরশুভাকাংখিনী, হতভাগিনী—

সুমিত্রা চৌধুরী

কিরীটি নাতিদীর্ঘ চিঠিখানা পড়ে শেষ করবার পরও, অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যে এক হতভাগিনী নারীর শেষ বিদায়ের দীর্ঘশ্বাস হাহাকার করে ফিরতে লাগল।

অনুচ্চারিত বেদনার্ত একটা সুর যেন বহুক্ষণ ধরে ঘরের বাতাসে মমরিত হতে থাকে।

সহসা আবার কিরীটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল: সুমিত্রা দেবী তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপ বা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন, কিন্তু আসল রহস্যের যবনিকা উত্তোলন এখনো হয়নি। তোমরা হয়ত এখনো বুঝতে পারছোনা বন্দী অবস্থায় অতি শিষ্ট ও শান্তভাবে মুখোসের অন্তরালে যে রক্ত লোলুপ সয়তানটি বসে আছে, তিন তিনটি নৃশংস হত্যা করেও যার রক্ত পিপাসা মেটেনি, ওর আসল ও অকৃত্রিম পরিচয়টা কি? কিরীটির কথায় সকলে একসংগে একবার অদূরে উপবিষ্ট মুখোসধারী বন্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিরাটি আবার সুরু করে: যতীন চাটুর্যে ছিল অরিন্দমেরই গুপ্ত বিপ্লবী দলের একজন। পাটনায় সে থাকতো, খোঁজ নিয়ে জেনেছি যতীন চাটুর্যে এখনো বেঁচে আছে এবং লোকে তার পক্ষাঘাত রোগ হয়েছে জানলেও, আসলে সে সম্পুর্ণ সুস্থ! অসুখটা, তার একটা ভাণ মাত্র। মধ্যবিত্ত এক ব্রাহ্মণ বংশে যতীনের জন্ম। প্রখর বুদ্ধি ও শ্রম সহিষ্ণুতা তার ছিল এবং দেখতে কন্দর্পের মত রূপবান। বাংগালীর ঘরে সাধারণত ও রকম প্রখর রূপ বড় একটা চোখে পড়ে না। লেখা পড়াতেও সে ছিল খুবই

ভাল ; পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র! সত্যেন ব্যানার্জীর পিতা পরমেশবাবু যতীন চাটুয্যের বাইরের রূপটা দেখেই ভুলেছিলেন এবং একমাত্র মেয়ের বিবাহ দিয়ে যতীনকে জামাই করছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, ঐ অপরূপ রূপের মধ্যে কত বড় নীচ লোভী একটা শয়তান বাস করতো। যতীন প্রথম জীবনে সত্যেনের দ্বারা প্ররোচিত হয়েই বিপ্লবী দলে নাম লেখায়। বিপ্লবী দলে নাম লিখালেও সত্যিকারের দেশ প্রেম তাকে কোন দিনও আকর্ষিত করতে পারেনি : করেছিল যে বস্তুটি আকর্ষণ, তা'হচ্ছে বিপ্লবী দলের সংগৃহীত লক্ষাধিক মুদ্রা। বিপ্লবী দলে থেকে আনুগত্যের ছল করে সর্বদা যতীন চিন্তা করতো ঐ অর্থ কেমন করে সে নিজে হস্তগত করবে। হঠাৎ একদিন দলে ভাংগন ধরলো—দলপতি ১নং ভাবলে সন্তোষের জন্যই অর্থাৎ তারই বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ সর্বনাশ ঘটেছে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা তা নয়—

হঠাৎ বাধা দিল অরিন্দম : তবে ? কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ?

'ঠিকই বলছি সুধাকান্তবাবু! এতবড় একটা দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন আপনি, অথচ এ সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। সন্তোষ মোটেই দোষী নয়। আসল হচ্ছে ঐ যতীন চাটুয্যে। যতীনই ষড়যন্ত্র করে শংকরনারায়ণকে হাত করে সামনে শিখণ্ডি শংকরনারায়ণকে দাঁড় করিয়ে, আড়াল থেকে নিজে কল কাঠি ঘুরাত। শংকরনারায়ণও

পাটনার ছাত্র এবং যতীনের সহপাঠি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। যতীনই পরামর্শ দিয়ে শংকরনারায়ণকে দিয়ে জরুরী দলিল পত্রগুলো সন্তোষের জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়ে বেনামীতে চিঠি লিখে আপনাকে জানায়, ও পুলিশের কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। টাকার প্রতি লোভ ছিল বটে তার কিন্তু টাকার হদিস সে জানত না। সে শংকরনারায়ণ দলের সেক্রেটারীকে বলেছিল, কতকগুলো জরুরী কাগজপত্র সন্তোষ চৌধুরীর কাছে গিয়ে দিয়ে আসতে কিন্তু সে বুঝতে পারেনি ভুলক্রমে শংকরনারায়ণ ঐ কাগজ পত্রের সংগে অর্থ যেখানে লুক্কায়িত আছে, সেই বাড়ীর প্ল্যানটাও দিয়ে আসবে। শংকরনারায়ণও অবিশ্যি ঐ প্ল্যানটা সম্পর্কে জানত না কারণ যতীনের সংগে সেও ঐ প্ল্যানটা হাতাবার চেষ্টায় ছিল। বাংলা দেশের কোন একটা গণ্ডগ্রামে, ঐ অর্থ এক পোড়ো বাড়ীর মাটির তলায় পোঁতা ছিল। ঐ বাড়ীর প্ল্যান ও জায়গার নির্দেশ সামান্য কয়েকটা সাংকেতিক শব্দ ও রেখা দিয়ে একটা কাগজের মধ্যে লেখা ছিল যেটা সহজে কাহারও নজর পড়বারও কথা নয়।

'আপনি—আপনি একথা কি করে জানলেন, মিঃ রায়? দলের মধ্যে আমি সন্তোষ ও সত্যেন ছাড়া ও আর কেউ জানত না। এমন কি সেক্রেটারী শংকরনারায়ণও না।' সুধাকান্ত বলে ওঠে।

কিরীটি মৃদু হেসে বলে: তাড়াতাড়িতে খুনী সেটা, নির্মল চৌধুরীর ওভারকোটের ভিতরের পকেটে ফেলে রেখে গিয়েছিল।'

সুব্রত চমকে ওঠে : লং-কোটের ভিতরের পকেটে ?

'হাঁ !—মাধবী ভিলায় প্রবেশ করে সন্তোষ চৌধুরীকে আক্রমণ করবার পূর্বে খুনী যে সাবধানতা নিয়েছিল, তার তুলনা নেই ! একটা বেনামা চিঠি দিয়ে সন্তোষ চৌধুরীর ছেলে নির্মল চৌধুরীকে মধুপুরে এনে, কোন এক ফাঁকে ওয়েটিং রুম থেকে নির্মলের লং-কোটটি চুরী করে নিয়ে যায়। তারপর সেই কোটটি গায়ে দিয়ে মাধবী 'ভিলায়' সে আসে। লম্বায় সে অনেকটা অর্থাৎ আমাদের খুনী নির্মল চৌধুরীর মতই হবে তাই তার মতলব ছিল হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে যদি কেউ তাকে দেখেও ফেলে, প্রথমে হয়ত নির্মল চৌধুরী বলেই ভুল করবে। যাহোক ঐ কোটটি সে গায়ে দিয়ে মাধবী ভিলায় যায় এবং সন্তোষ চৌধুরীকে নীচে নিয়ে এসে যখন তার কাছে জানতে পারে, কাগজপত্রগুলো যে গুলো শংকরনারায়ণ বহুকাল আগে সন্তোষের কাছে রাখতে দিয়েছিল—লাইব্রেরী ঘরে আছে—- খুনী সর্বাগ্রে সেগুলো গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসে এবং কোটের ভিতরকার পকেটে রাখে। পরে সন্তোষ চৌধুরীকে খুন করে সমস্ত সন্দেহ নির্মল চৌধুরীর পরে যাতে পড়ে, সেই পরিকল্পনায় মাধবী ভিলায় ফিরে এসে, লং-কোটটি সিঁড়ির নীচে ষ্ট্যাণ্ডে খুলে টাংগিয়ে রেখে যায়। কিন্তু বিধাতার বিচার বড় সূক্ষ্ম এবং বড় অমোঘ। কোটের পকেট হতে কাগজপত্র গুলো নিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে ছোট একটি কাগজের অংশ, যাতে আসল ব্যাপারটি অর্থাৎ গুপ্ত অর্থের প্ল্যানটা লেখা ছিল

সেটাই, খাস কোটের পকেটে থেকে যায়। পুরাতন কাগজ পিন থেকে খুলে গিয়েছিল। আমি লং-কোটের পকেট হাতড়াতে গিয়ে কাগজটি পাই। ক্রমে সব বুঝতে পারি। খুনী প্রথম থেকে নির্মল চৌধুরীকে তার পিতার হত্যাকারী রূপে দাঁড় করাবার জন্য, প্ল্যান মাফিক প্রতিটি কাজ করেছে। খুনী যে নির্মলবাবু হ'তে পারেন না, মাত্র তিনটি ব্যাপারে তা' আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছিল। ১নং হচ্ছে ঐ লং-কোটটি দুই নং হচ্ছে একপাটি নতুন নিউকাট জুতো, যেটা আমি মাধবী ভিলার বাগানে কফির চারাগাছের নীচে, পরের দিন প্রত্যূষে কুড়িয়ে পাই। ৩নং হচ্ছে ঐ লং-কোটের পকেটেই আমি কলকাতা টু মধুপুরের class I এর একখানা টিকিট পাই, যে টিকিটের date of issue অনুসারে জানতে পারি, সন্তোষ চৌধুরী যে রাত্রে নিহত হন সেই দিন ভোর রাত্রে অর্থাৎ হত্যার পরে নির্মল চৌধুরী মধুপুরে এসে পৌঁছান। এবং তখুনি বুঝতে পারি নির্মলবাবুর বিরুদ্ধে কতবড় চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আসল খুনী যেই হোক ব্যাপারটা আগাগোড়াই comedy of errorsয়ে পর্যবেসিত হয়েছিল! অন্যের চক্রান্তে সুধাকান্তবাবু, সন্তোষ ও সত্যেনকে ভুল বুঝেছিলেন। সন্তোষ ও সত্যেন, সুধাকান্তকে ভুল বুঝেছিলেন। সুমিত্রা তার স্বামী সন্তোষকে ভুল বুঝেছিলেন। নির্মল চৌধুরী তার পিতা সন্তোষ চৌধুরীকে ভুল বুঝেছিলেন। ভুল! একটা বিরাট ভুলের গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছিল

—যার ফলে অরিন্দম, সুমিত্রা ও সন্তোষের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল।

'সবচাইতে মর্মান্তিক কি ভুল জানেন, মিঃ রায় ?—' হঠাৎ সুধাকান্ত বলে ওঠেন : সুমিত্রার ভুল। প্রথমে ত' সে আমাকেই তার জীবনের কুগ্রহ বলে মনে করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সে জেনে গেছে আমিই সে রাত্রে গিয়ে তার স্বামীকে হত্যা করেছি অথচ—

'আমি জানি—' বাধা দিল কিরীটি : আমি জানি সুধাকান্ত বাবু, সে রাত্রে ও দলে আপনি মোটেই ছিলেন না। যতীনই আপনার ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল !

'যতীন ?—'

'হাঁ যতীন চাটুয্যে।

'তবে কি ! তবে কি—ঐ বসে যতীন চাটুয্যেই, মিঃ রায় ? ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুধাকান্ত।

'ব্যস্ত হবেন না সুধাকান্তবাবু এখুনি ঘোমটা খুলবো বাকী বক্তব্যটুকু আমার শেষ করে নিই।'

কিরীটি আবার তার অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে সুরু করে : সে রাত্রে সন্তোষ চৌধুরীকে যারা খুন করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল যতীন চাটুয্যে একজন শংকরনারায়ণ, আর তৃতীয় ব্যক্তি, তার কথাই এবারে বলবো। দূষিত রক্ত হতে জন্ম যার, ব্যাধিগ্রস্থ বীজ হতে যার সৃষ্টি, সে সৃষ্টি'ত কখনো ভাল হ'তে পারে না। এক্ষেত্রে ঐ খুনীও সেই tradition

থেকে বিচ্যুত হয়নি। জঘন্য চরিত্রের এক স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রী উন্মাদ হয়ে গেলেন, কিন্তু পুত্র হলো ঠিক বিপরীত—পিতার চাইতেও জঘন্য ও হীন চরিত্রের। লেখা পড়া এবং শিক্ষা পেলেও পিতৃগতহীনতাই তাকে দিনের পর দিন অর্থ লোলুপ করে তুলতে লাগল। অর্থের লোভে সে ভয়ংকর পথ বেছে নিল। এবং এক্ষেত্রে সে তার পিতাকেও ডিংগিয়ে গেল। পিতার পূর্ব জীবনের সব কথা সে পিতার মুখেই শুনেছিল এবং একদিন সে সেই কাহিনীকে সম্বল করেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো—১নং পরিচয়ে দলের কাছে আর বাহিরে 'কালোপাঞ্জা' পরিচয়ে। যতীনের কাছে ১নং পরিচয়ে পত্র দিয়ে, তার মনেও আবার অতীতকালের অর্থলিপ্সা জাগিয়ে তুলল। যতীন এগিয়ে এলো নূতন উদ্যমে। সন্তোষকে হত্যা করে কাগজ পত্রের মধ্যে যখন সে অর্থের সেই প্ল্যানের কোন হদিস পেলনা, সম্ভবত তখুনি সে শংকরনারায়ণকে চেপে ধরে কিন্তু শংকরনারায়ণ ও যখন কোন সদুত্তর দিতে পারল না তার প্রশ্নের—পরের দিন সন্ধ্যায় সে শংকর নারায়ণকেও হত্যা করলো। পরে সে ভাবলে হয়ত কাগজটা আছে সত্যেন ব্যানার্জীর কাছে, সেই আশায় সত্যেন ব্যানার্জীকে সে আক্রমণ করে এবং তাকেও হত্যা করে। নির্মল চৌধুরী ম্যাকসিকো থেকে চার খানা হাতীর দাঁতের বাট ওয়ালা ছুরি এনেছিল, যার দু'খানা তার কাছে ছিল—বাকী দু'খানার একখানা সে মাকে অর্থাৎ সুমিত্রা দেবীকে দেয়, অন্য খানা দেয় মীনুকে। ঐ ছুরি দিয়ে হত্যা করবার মধ্যেও খুনীর

পরিকল্পনা ছিল নির্মল চৌধুরীকে ফাঁসান। নির্মল চৌধুরীর পরে খুনীর অর্থাৎ ওঁর ...ত জাতক্রোধ যে কেন, তা উনিই জানেন।

ওর পক্ষে সুমিত্রা দেবীর হস্তাক্ষর নকল করাটাও অসম্ভব কিছু ছিল না—কারণ এককালে কলেজ জীবনে উনি যে শুধু ভাল একজন স্পোর্টস ম্যানই ছিলেন তা নয়, ছোটখাটো একজন শিল্পী ও ছিলেন। মহাশয় ব্যক্তি উনি! কেবল খুনীই নন—জালিয়াতও! চিঠি লিখে প্ল্যান করে, সব কিছুই উনি সুষ্ঠু ভাবে করেছিলেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে মারাত্মক ভুলটি করেছিলেন, সেটা হচ্ছে আমাকেও একখানা পত্রাঘাত করে এই ব্যাপারে টেনে এনে।

উনি জানতেন না যে উনি যেই হোন আমি কিরীটি রায়।

'বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে এসে কিরীটি উপবিষ্ট বন্দীর মুখ হ'তে মুখোসটি উন্মোচন করতেই সকলে চমকে ও...

একি! আর্ত অস্ফুট চীৎকারে মৃণালিনী দেবী বলে...

অনুদা!

'হাঁ, আমাদের বর্তমান রহস্যের মেঘনাদ শ্রীমান অনিল চাটুয্যে, স্বনামধন্য যতীন চাটুয্যের একমাত্র পুত্র ও বংশধর।

বলতে বলতে কিরীটি সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বলে: মনে পড়ে সুব্রত! সেদিন সন্ধ্যায় মধুপুরে পৌঁছে, মাধবী ভিলার পথে যেতে যেতে যখন এই কলির এ্যাপালোর মত, বাহিরের সুশ্রী

চেহারাটা দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলি আমি বলেছিলাম চকিত চঞ্চল 'চাউনি। Significant ! এবং বলেছিলাম : তোরা যে চোখের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান পাস, সেখানে আমি মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্য বশতঃ, সৌন্দর্য ছাড়াও অন্য কিছুর ইংগিত পাই ! Now you see ! দেখ আমার কথা সত্যি না মিথ্যে ! বলতে বলতে অনিলকে সম্বোধন করে কিরীটি : বন্ধু ! সেদিন গোধূলী লগ্নে তোমার ও শুভ দৃষ্টি আর যাকেই ফাঁকি দিক আমাকে দিতে পারেনি। এখন বুঝতে পেরেছো বোধ হয় ? ভাবছো তোমাকে কেমন করে সন্দেহ করলাম না ? একটি—মাত্র একটি কারণেই তোমার প্রতি আমি সন্দিহান হয়ে উঠি। মনে পড়ে বন্ধু প্রথম রাত্রে তোমার সংগে আমার যথা আলাপ হয়, তুমি বলছিলে মাকে নিয়ে তুমি দিদিমার ওখানে বেড়াতে এসেছো ! কিন্তু বাড়ীতে তোমাদের গিয়ে যখন জানা সে, মৃণালিণী দেবী নিখোঁজ, তোমার দিদিমা ব্যস্ত হয়ে ঘর বার করছেন অথচ তোমার মার কোন দেখা নেই, তখনই আমার মনে তোমার প্রতি সন্দেহ জাগে। দ্বিতীয়তঃ, তারপরই বাগানের মধ্যে যে এক পাটি জুতো তুমি ফেলে এসেছিলে সে রাত্রে তাড়াতাড়িতে, তার দ্বিতীয় পাটি উদ্ধার করেছি আমি মধুপুরে তোমারই ঘর থেকে, ছদ্মবেশী পুলিশের সাহায্যে। তারপর পাটনায় লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে তোমার ও তোমার পিতৃদেবের ইতিহাস, বাকীটা আমাকে অন্ধকারে আলো দিয়েছে। তোমার যে শেষ ভয় ছিল, মীনু তোমার সব কথা একদিন না জানতে পারে বলে

তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করবে, সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই এখানে এত রাত্রে এসে হানা দিয়েছিলাম।

*　　*　　*　　*

ঘরের মধ্যে সকলেই স্তম্ভিত।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো।

'বড় চাল চেলেছিলে বন্ধু 'কালোপাঞ্জা'র ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে—একটা কথা জানতে না মাথার ওপরে এমন একজন ভানুমতী আছেন আমাদের সকলকার, যাঁর 'খেলা' বড় মর্মান্তিক। সাজান ঘরে সে হানে বজ্রাঘাত—জ্বালে আগুন—আবার মরা ডালে সে ফোটায় ফুল।

সুব্রতর ডাইরীর শেষাংশ :

স্তব্ধ বিমূঢ় আমরা সকলে তখনও।

সিঁড়িতে অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে : বোধ হয় তালুকদার সাহেব সদলবলে পৌঁছে গেলেন।

সত্যি ! মানুষ ভুল করে, কিন্তু হঠাৎ এক এক সময় কত বড় মর্মান্তিক বেদনা যে সেই ভুলকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে কালোছায়া ফেলে : ভাবতেও শিউরে উঠ্‌তে হয়। বেচারী সুধাকান্ত, হতভাগিনী সুমিত্রা, হতভাগ্য সন্তোষ চৌধুরী—আর হতভাগ্য সত্যেন ব্যানার্জী।

ভুল করলেও সুমিত্রা-সন্তোষ ও সত্যেন, আজ আর নেই।

কিন্তু সুধাকান্ত! এখনো তাকে কতদিন বাঁচতে হবে কে জানে?

জীবনের কবরখানায় বসে কে জানে এখনো কতকাল তাকে অশ্রু বিসর্জন করতে হবে!

যে ভালবাসা সে জীবনে কোন দিনই ব্যক্ত করলে না—যে ভালবাসা স্বর্গের চেয়েও পবিত্র, সেই ভালবাসা দয়িতের কাছে কত বড় অভিশাপ এনে দিল—যার আগুনে দয়িতা মরলো পুড়ে—সে রইলো জীবন ভোর কান্না নিয়ে—

—সমাপ্ত—